সমাজতন্ত্রের পরিচয়

আবদুল হালিম

সমাজতন্ত্রের পরিচয়

এমিলি আপাকে

রাজশাহী

আবদুল হালিম

প্রকাশনা :
এম, আবদুল হক
প্রকাশ ভবন
৫, বাংলা বাজার, ঢাকা—১
মুদ্রণ :
মীর আবদুল মান্নান
মীরকো প্রেস
৫৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা—১
প্রচ্ছদপট :
আবদুল মুকতাদির
প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়—১৩৭৯
পরিবর্ধিত সংস্করণ :
মাঘ—১৩৮০
পুনর্মুদ্রণ :
কার্তিক—১৩৮৮
দাম :
চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

সূচীপত্র

সমাজতন্ত্রের পরিচয়

স্বাধীন বাঙলাদেশের তিনটি মৌল জাতীয় নীতির অন্যতম হল সমাজতন্ত্র। কিন্তু সমাজতন্ত্র বলতে সত্যিই কি বোঝায় সে সম্পর্কে অনেকের মনেই স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। বস্তুত, এত বিভিন্ন লোক শব্দটাকে এত বিভিন্ন অর্থ প্রয়োগ করে থাকেন যে, 'সমাজতন্ত্র' শব্দটা এখন আর একটা সুনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করছে না। অথচ, 'সমাজতন্ত্র' শব্দটা নিশ্চয়ই আপামর জনসাধারণের চোখে কোন একটা মহৎ ভাব বা বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। তা না হলে 'সমাজতন্ত্র' কথাটায় এমন কি যাদু আছে যে, দেশে দেশে বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীগুলো আজকাল সমাজতন্ত্রের কথা বলে বেড়াচ্ছে?

সমাজতন্ত্র বাস্তবায়িত হয়েছে সোভিয়েতেই:

কমিউনিষ্টরা অবশ্য বরাবরই সমাজতন্ত্রের কথা বলে এসেছেন। গত সওয়া শ' বছর ধরে পৃথিবীর দেশে দেশে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলো প্রচার করেছে যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাদের লক্ষ্য। এবং অন্নাধিক পঞ্চাশ বছর আগে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে সেখানকার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে। তারপর ইউরোপ, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেকগুলো দেশেও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম হয়েছে। এ পর্যন্ত যে চৌদ্দটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হল: সোভিয়েত ইউনিয়ন সাধারণভাবে রাশিয়া নামে পরিচিত), মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্র, যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি,

রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (পূর্ব জার্মানী), উত্তর কোরিয়া, গণচীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, কাম্পুচিয়া। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মত নিখুঁত সমাজতন্ত্র আজ পর্যন্ত অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এবং আমাদের দেশে ও সারা পৃথিবীতে সাধারণ মানুষ সমাজতন্ত্রের তত্ত্বগত দিক পুরোপুরি অনুধাবন করতে না পারলেও এই সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সমাজব্যবস্থা কায়েম হয়েছে তাকেই প্রকৃত সমাজতন্ত্র মনে করে থাকেন। অতি অল্পকালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভূতপূর্ব উন্নতি, সোভিয়েতের জনজীবন থেকে অনাহার, অশিক্ষা, শোষণ অনাচারের মূলোচ্ছেদ ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার শোষিত মানুষের মনে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। এ কারণেই সব দেশের বুর্জোয়া দলগুলো জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে তাদের চেতনাকে খাটো করার জন্য এবং প্রকৃত সমাজতন্ত্র থেকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার জন্য জোরে-সোরে সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করে থাকে। এ ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার একমাত্র উপায় হল খাঁটি সমাজতন্ত্র, যাকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বলে অভিহিত করা হয়, সে সম্পর্কে জনগণকে পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করা এবং শুধু সমাজতন্ত্র শব্দটা নিয়ে হৈ চৈ না করে প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

সমাজতন্ত্র একটা বিশিষ্ট সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার কমিউনিষ্টরা নিজ দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলতে তাঁরা একটা নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থাকে বুঝিয়ে থাকেন। এ কথাটার পুরো অর্থ বুঝতে হলে মানব সমাজের ইতিহাস, সংক্ষেপে হলেও,

আলোচনা করা দরকার। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বলতে সামগ্রিকভাবে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং লেনিন কর্তৃক পরিবর্ধিত জগৎ বিকাশের এবং মানব সমাজের বিকাশের সাধারণ তত্ত্বকেও বোঝানো হয়ে থাকে। এবং এ তত্ত্ব অনুযায়ী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার মাধ্যমে যে বিজ্ঞানসম্মত ও শ্রেণীশোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা হয় সে সমাজব্যবস্থাকেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলা হয়ে থাকে। তবে, একই শব্দকে দুই অর্থে ব্যবহার করা হলেও, প্রসঙ্গ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলতে কখন সমগ্র মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ তত্ত্বকে বোঝান হয় আর কখন মার্ক্সবাদসম্মত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বোঝান হয়।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্র :

দূর অতীতে মানবগোষ্ঠীর উদয় হওয়ার মানুষ এ পর্যন্ত কয়েকটি সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে। এ সমাজগুলো এক একটা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠত এবং এক একটা সমাজব্যবস্থায় এক এক ধরনের সামাজিক সম্পর্ক, চিন্তা ভাবনা, মনোভাব ইত্যাদি দেখা দিত। যেমন প্রথমে ছিল পশুশিকারী আদিম সমাজ। এ সমাজে সকলে মিলে পশু শিকার করে জীবন নির্বাহ করত। কোন রকম ধনসম্পদ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এ যুগে ছিল না। এ সমাজে সকলের অবস্থা এক রকম ছিল এবং সকলেরই সমান অধিকার ছিল; বস্তুত, সকলেই সমান অসহায় এবং পরস্পরের উপর সমান নির্ভরশীল: একে অপরের

উপর দাপট চলাত না, তার উপায়ও ছিল না এবং সে রকম মনোভাবও ছিল না। এ সমাজকে বলা হয় আদিম শ্রেণীহীন সাম্য সমাজ।

এর পরে, কৃষি আবিষ্কারের ফলে এবং উৎপাদন যন্ত্রের ক্রমিক উন্নতির ফলে আদিম সাম্য সমাজ ভেঙ্গে পড়ে এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উদয় হয়। শ্রেণী সমাজ বলতে বোঝায় এমন সমাজব্যবস্থা যেখানে একদল মানুষ (এরা সংখ্যায় অল্প) অবশিষ্ট ব্যাপক সংখ্যক জনগণকে শোষণ করে টিকে থাকে। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে মোটামুটি তিন ধরনের শ্রেণীসমাজ উদিত হয়েছে। প্রথমে দাস সমাজ, পরে সামন্ত সমাজ (বা জমিদারতন্ত্র) এবং সবশেষে পুঁজিবাদী সমাজ। দাস সমাজে স্বাধীন দাস-মালিকরা তাদেরই পদানত দাস সমাজের পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদের অধিকারী হত। সামন্ত সমাজে জমিদাররা কৃষকের পরিশ্রমে সৃষ্ট ফসলে ভাগ বসাত এবং কৃষকদের দিয়ে বেগার খাটাত। পুঁজিবাদী সমাজে যদিও শ্রমিকরাই সব সম্পদ উৎপন্ন করে, উৎপন্ন সম্পদের অধিকারী হয়, কিন্তু কি এক যাদুর বলে, তথাকথিত মিল-মালিকেরা, শ্রেণীসমাজে দাস মালিক, জমিদার, পুঁজিপতি ইত্যাদি শোষকশ্রেণীগুলো পরম বিলাসে জীবন কাটায় এবং সত্যিকার সম্পদ সৃষ্টিকারীরা হয় শোষিত ও অবহেলিত আর তারাই হয় অনাহার, অশিক্ষা আর অনাচারের শিকার। শ্রেণীসমাজে শোষক শ্রেণীগুলো নিজেদের শোষণ ও স্বার্থ অব্যাহত রাখতে গিয়ে নানা প্রকার অসৎ প্রবৃত্তি অর্জন করে এবং তাদের সেই কুটিল চিন্তা তারা সঞ্চারিত করে সমগ্র সমাজের মধ্যে। তাই আদিম সাম্য সমাজে যেমন ছিল মানুষে মানুষে সমতা ও প্রীতির সম্পর্ক, শ্রেণীসমাজে তেমন ঘটে না। শ্রেণী সমাজের মানুষ স্বার্থপরতা, হীনতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট। এগুলো মানুষের সহজাত ধর্ম নয়, সমাজব্যবস্থার গুণেই এসব দোষ মানুষ অর্জন করে। ভবিষ্যতে শ্রেণী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে আবার মানুষে মানুষে প্রীতি ও সমতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঐতিহাসিক বিচারে সমগ্র শ্রেণীসমাজের প্রধান গুরুত্ব হল, এর মধ্য দিয়ে উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে এবং উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের ফলেই পূর্বোক্ত সমাজব্যবস্থা একের পর এক ভেঙ্গে পড়েছে। পূর্বোক্ত একেকটা সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন যন্ত্রের বিকাশ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রচলিত সমাজ সংগঠন আর উন্নত উৎপাদন পদ্ধতির সাথে খাপ খায় না, তখনই ভেঙ্গে পড়েছে সে সমাজব্যবস্থা। কারণ, সমাজ-ব্যবস্থাগুলো গড়েই ওঠে উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। যেমন অনুন্নত ও দুষ্প্রাপ্য ব্রোঞ্জের হাতিয়ারকে অবলম্বন করে পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল দাস সমাজের। পরে যখন লোহার তৈরী উন্নত ও সুলভ হাতিয়ার আবিষ্কৃত হল তখন দেখা গেল ইউরোপে কৃষি উৎপাদন সম্প্রসারিত করতে পারে দাসত্বমুক্ত কৃষক সমাজ। এ বাস্তব কারণেই ইউরোপে পঞ্চম শতাব্দীতে দাস সমাজ অচল হয়ে ভেঙ্গে পড়ল, তার স্থান নিল সামন্ত সমাজ। আবার, ১৫-১৭শ শতাব্দীতে দেখা গেল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিকাশ সাধনের বড় অন্তরায় হচ্ছে অকেজো সামন্ত সমাজ। এ সমাজও তাই ভেঙ্গে পড়ল।

ধনতন্ত্রের সঙ্কট :

চার শ' বছর রাজত্ব করার পর ধনতন্ত্র আজ পৃথিবীব্যাপী একই রকম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। ধনতন্ত্রের যুগে উৎপাদন ব্যবস্থার এমন প্রসার ঘটেছে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজ সংগঠন আর তার সাথে এঁটে উঠতে পারছে না। এর কারণ হচ্ছে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যাপক-সংখ্যক মেহনতী মানুষের মিলিত শ্রমে পণ্য উৎপাদিত হয় আর মালিক হয় পুঁজিপতি। দার্শনিক ভাষায় বলা হয়, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রকৃতি হল

সামাজিক (অর্থাৎ সমগ্র সমাজের শ্রমে এর উৎপাদন হয়) আর তার মালিকানার প্রকৃতি হল ব্যক্তিগত—পুঁজিপতিই এর মালিক। বর্তমান যুগ সাইবারনেটিক্স-এর যুগ—স্বয়ংচল পদ্ধতিতে এখন উৎপাদন হচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন অভূতপূর্ব পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এ মুহূর্তে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য প্রাচুর্য সৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু তার প্রধান বাধা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত মালিকানা।

ধনতন্ত্রের পর শ্রেণীহীন সাম্যবাদ :

এ বাধা অপসারণ করলেই সম্ভব পৃথিবীর সব মানুষের হাতে সভ্যতার সব উপকরণ পৌঁছে দেওয়া। শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজ ধ্বংস করে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেই সম্ভব বর্তমান পৃথিবীর মানুষে মানুষে অসাম্য ও অনৈক্যের অবসান ঘটানো এবং সবরকম শোষণ, জাতি-গত নিপীড়ন ও অন্যান্য অনাচার বিলোপ করা।

সাম্যবাদের প্রথম স্তরই সমাজতন্ত্র :

এ সাম্যবাদী সমাজের প্রথম ধাপকেই মার্কসবাদী সমাজ বিজ্ঞানীরা 'সমাজতন্ত্র' নামে অভিহিত করেছেন। সাম্যবাদী সমাজের প্রাথমিক পর্যায় হলেও এটা একটা সুনির্দিষ্ট এবং অলঙ্ঘনীয় সমাজ ব্যবস্থা বলে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার কমিউনিষ্টরা সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকেই আপাতত নিজেদের লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করে থাকেন। কারণ 'সমাজতন্ত্র' পর্যায়টি বাদ দিয়ে সাম্যবাদী

পর্যায়ে উত্তরণ সম্ভব নয় এবং সমাজতন্ত্রের বিস্তৃতি ও বিকাশের মাধ্যমেই পুরো সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছান সম্ভব হবে।

উপরে ব্যবহৃত 'অলঙ্ঘনীয় সমাজব্যবস্থা' কথাটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে আমরা যে কয়েকটি সমাজ-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছি, তা কেবল সমগ্র মানব সমাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে মানব সমাজ ঐতিহাসিক ধাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু কোন বিশেষ দেশ বা জাতির পক্ষে ঐ সব সমাজব্যবস্থার সব কটির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। পৃথিবী যখন অগ্রসর হয়ে গেছে তখন কোন কোন পশ্চাদ্‌পদ দেশের পক্ষে দু'একটা ঐতিহাসিক পর্যায় বাদ দিয়েও অগ্রসর হয়ে যাওয়া সম্ভব। যেমন পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র আবির্ভূত হওয়ার পর অনেক জাতি আদিম সাম্যবাদী স্তর থেকে দাসযুগ এড়িয়ে সরাসরি সামন্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। আবার পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর ইউরোপের অনেক দেশ অনুন্নত সামন্ত পর্বায় থেকে একলাফে উন্নত ধনতান্ত্রিক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে কয়েকটা ঐতিহাসিক পর্যায় অতিক্রম করে। বর্তমানকালেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেক সামন্ততান্ত্রিক দেশ ও জাতি পুঁজিবাদী স্তর সম্পূর্ণ এড়িয়ে সরাসরি সমাজতন্ত্রে পৌঁছেছে—যেমন, উজবেকিস্তান ইত্যাদি মধ্য এশীয় দেশ, মঙ্গোলিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম প্রভৃতি। কিন্তু সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এ কথা খাটে না। আদিম সাম্যবাদী স্তর থেকে সব কটি ঐতিহাসিক পর্যায় এড়িয়ে একলাফে সমাজতন্ত্রে এসে পৌঁছান সম্ভব, কিন্তু অত্যুন্নত পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষেও সমাজতন্ত্র এড়িয়ে সাম্যবাদে পৌঁছান সম্ভব নয়। এ অর্থেই, সমাজতন্ত্র একটা অলঙ্ঘনীয় সমাজব্যবস্থা। ইতিহাসে সমাজতন্ত্রের ভূমিকা হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার বৈষয়িক ও ভাবগত ভিত্তিভূমি সৃষ্টি করা।

শ্রেণী শোষণহীন সমাজের দুই পর্যায় : সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ :

শ্রেণী বিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করে মানবসমাজ এখন অগ্রসর হয়ে চলেছে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে। পূর্ণ শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা হল সাম্যবাদ। সাম্যবাদের প্রথম স্তর বা পূর্ণ সাম্যবাদের পূর্ববর্তী পর্যায়ের নাম হল সমাজতন্ত্র। সাম্যবাদের প্রথম পর্যায় হওয়ার ফলে তার সাথে সমাজতন্ত্রের কতগুলো বিষয়ে গভীর মিল আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে যেগুলো পূর্ণ সাম্যবাদ থেকে গুণগতভাবে পৃথক, কিন্তু এ বৈশিষ্ট্যগুলো অনুধাবন করতে হলে নতুন শ্রেণীশোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার উপরোক্ত দুই পর্যায় সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও সামগ্রিক আলোচনা প্রয়োজন।

নতুন সাম্যবাদী সমাজের দুটো পর্যায়ই অত্যন্ত উন্নত বৈষয়িক (বা বস্তুগত) এবং কারিগরি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ দুই সমাজ ব্যবস্থারই মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানা এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অনুপস্থিতি।

সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ উভয় সমাজ ব্যবস্থাতেই উৎপাদনের উপায়-সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বা শোষক শ্রেণী এবং মানুষের উপর মানুষের শোষণ থাকে না। এর ফলে এ দুই সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্ক হল পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক। (এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, এক একটা সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন যন্ত্রকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে যাকে বলা হয় উৎপাদন সম্পর্ক। যেমন মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, আদিম পশু শিকারী সাম্য-সমাজ ট্রাইব বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সব মানুষ ছিল জমি,

পশু ইত্যাদি উৎপাদন উপায়সমূহের যৌথ মালিক এবং ফলে তাদের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্ক ছিল সমতার সম্পর্ক। দাসসমাজে, দাসমালিকরা ছিল উৎপাদন যন্ত্র ও দাসদের—দাসরাও ছিল উৎপাদন যন্ত্রের অন্তর্গত—মালিক। তাই সেই সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক ছিল দাস ও দাস-মালিকের সম্পর্ক তথা শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। সামন্ত সমাজে জমিদার ছিল উৎপাদন যন্ত্রের, যথা, জমির মালিক ; তাই সেখানে মালিক জমিদার ও মালিকানা বঞ্চিত ভূমিদাস কৃষকদের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন যন্ত্র অর্থাৎ কলকারখানার মালিক হল ধনিকরা এবং মালিকানা বঞ্চিত শ্রমিকরা হল মজুরি দাস ; তাই এ সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হল ধনিক ও শ্রমিক তথা শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ধনিকের মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক। কিন্তু সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে উৎপাদন যন্ত্র রাষ্ট্র তথা সমগ্র জনগণের সম্পত্তি বলে সব মানুষ ঐ উৎপাদন যন্ত্রের যৌথ মালিক। তাই সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক তথা উৎপাদন সম্পর্ক হল সমতার ও সহযোগিতার সম্পর্ক।)

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা :

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ উভয় সমাজেই পরিকল্পিত ও সুষম অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ম কার্যকর হয়। ফলে দুই সমাজেই সামাজিক উৎপাদনের লক্ষ্য হল মানুষের পরিপূর্ণ বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদা পূরণ এবং এ লক্ষ্য পূরণের পন্থা হল সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারের ভিত্তিতে উৎপাদনের বিরামহীন সম্প্রসারণ ও বিকাশ সাধন।

আন্তর্জাতিক নীতি : শান্তি ও মৈত্রী :

শ্রেণী শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজে জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের ভিত্তি হল বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার নীতি। কারণ পুঁজিবাদের মত সমাজতন্ত্র স্বদেশের শ্রমজীবী জনগণকেও শোষণ করে না, আবার অন্য দেশ বা জাতিকেও পদানত রেখে শোষণ করে না। অন্য সব দেশের সাথে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজের সম্পর্কের মূলনীতি হল শান্তি—অর্থাৎ যুদ্ধ প্রতিরোধ করা, শান্তি বজায় রাখা ও সুরক্ষিত করা। এই দুই সমাজেই সমাজ ও ব্যক্তিগত মানুষের সম্পর্ক হল প্রীতি ও সামঞ্জস্যের সম্পর্ক এবং দু' সমাজেই সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শই সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহের এ রকম গভীর মিলনের জন্যই মার্কসবাদ লেনিনবাদী শাস্ত্রে তাদের একই সাম্যবাদী সমাজের দুই স্তর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সমাজতন্ত্র অসম্পূর্ণ সাম্যবাদ :

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্র উদ্ভূত হয় বলে পুরনো সমাজের অনেক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এ সমাজেও টিকে থাকে। যেমন, সাবেক ধরনের শ্রম বিভাগ, পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্যের অভাব, মানুষের চিন্তায় ও ব্যবহারে অতীত সমাজের ছাপ যথা আত্মস্বার্থবোধ, আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা ইত্যাদি। সমাজতন্ত্রে উৎপাদন পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে না বলে এ সমাজে উৎপাদনের মালিকানার ক্ষেত্রে সমতা স্থাপিত হলেও বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা থেকে যায়। তাই এ সমাজের নীতি হল : "সকলে সাধ্যমত ও ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রম

করবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।" এ সকল কারণেই সমাজ-তন্ত্রকে বলা হয় অবিকশিত, অসম্পূর্ণ সাম্যবাদ।

সাম্যবাদের পরিচয়ঃ

কিন্তু সাম্যবাদে উৎপাদনের যান্ত্রিকীকরণ এবং স্বয়ংচল যন্ত্রের প্রয়োগ এত অকল্পনীয় ব্যাপক হারে ঘটতে থাকে এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের উৎপাদন এত বৃদ্ধি পায় যে, সম্পূর্ণ অভিনব এক সাম্যবাদী নীতি—"সকলে ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রম করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পাবে"—এই মহান নীতি কার্যকর করা সম্ভব হয়। সাম্যবাদী সমাজে শ্রম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী আমূল পরিবর্তিত হয়। সেখানে সব মানুষের অন্তর থেকেই আগ্রহ জাগে সমাজের কল্যাণের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাজ করতে।

সাম্যবাদী সমাজে শুধু অর্থনীতিতে নয় সামাজিক সম্পর্কে এবং মানুষের চিন্তা ও আচরণেও ব্যাপক গুণগত পরিবর্তনের সৃষ্টি হবে। সারা দেশের বৈদ্যুতিকীকরণ এবং কৃষির যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি সাধনের ফলে গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দূর হবে; শ্রমিক কারিগরদের উচ্চশিক্ষা লাভ এবং বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও বুদ্ধিজীবীদের উৎপাদন ও বাস্তব শ্রমসাধ্য কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমীদের মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত হবে (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে, বিশেষতঃ ধনতান্ত্রিক সমাজের একটা বড় অসংগতি হল মানসিক ও দৈহিক শ্রমের অসংগতি, অর্থাৎ এ সব সমাজে একদল লোক শুধু মানসিক শ্রমে নিযুক্ত, ফলে বাস্তবের সাথে সম্পর্কহীন এবং আরেক দল শুধু দৈহিক পরিশ্রম করে, কিন্তু জ্ঞানের অভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সমাজের উন্নতির কাজে লাগাতে পারে না)। ক্রমে, শ্রেণী শোষণ ও পরজাতি শোষণের সমস্ত অবশেষসমূহ লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর শোষণের যন্ত্ররূপে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজন থাকবে না।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন রোধের জন্য সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রেরও আর প্রয়োজন থাকবে না। সাম্যবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাই রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে তার স্থানে দেখা দেবে সাম্যবাদী সামাজিক সুশাসন।

সাম্যবাদী সমাজ হচ্ছে উচ্চ সামাজিক চেতনাসম্পন্ন মুক্ত মানুষের সুসংগঠিত সমাজ। সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের জন্য সময় প্রয়োজন আর প্রয়োজন কতগুলো বৈষয়িক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি: যথা, ব্যাপক বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি, শোষণমুক্ত ও উন্নত সামাজিক সম্পর্ক, সুবিকশিত সংস্কৃতি এবং জনগণের উচ্চ রাজনৈতিক চেতনা। এ সকল পূর্বশর্ত পূরণ করা এবং বৈষয়িক ও সামাজিক প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করাই সমাজতান্ত্রিক সমাজের কাজ।

সমাজতন্ত্রের যথার্থ পটভূমিকা এবং পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এখন সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি, রাজনৈতিক সংগঠন, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাক।

সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি:

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। পুঁজিবাদ হল: উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন আর সমাজতন্ত্র হচ্ছে: উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে ভোগ-ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত উৎপাদন। সমাজতন্ত্রের এ সংজ্ঞার মধ্যে পুঁজিবাদের সাথে তার সর্ব বিষয়ে অমিল পরিষ্কার ফুটে উঠে। পুঁজিপতি পণ্য উৎপাদন করে বিক্রির জন্য,

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় বাজারের মাধ্যমে, তাই সেখানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অরাজকতা, নৈরাজ্য দেখা দেয়। কারণ পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিরা ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের জন্য সামাজিক প্রয়োজনের তোয়াক্কা করেই না। ফলে যে জিনিষের চাহিদা বেশী, সরবরাহ কম, তার দাম বেড়ে যায় এবং সব পুঁজিপতি সেদিকে ধাবিত হয় পুঁজি বিনিয়োগের জন্য; আবার যে জিনিস প্রয়োজনের চেয়ে বেশী উৎপাদিত হয়ে গেছে তার দাম পড়ে যায় এবং সেখান থেকে পুঁজিপতিরা পুঁজি উঠিয়ে নেয়। এভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় বাজারের মাধ্যমে এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি চলতে থাকে অন্ধের মত ঠোকর খেয়ে। বাজার কখনও হয় তেজী, কখনও মন্দা এবং কিছুকাল পরে পরেই ধনতান্ত্রিক জগতে দেখা দেয় অর্থনৈতিক সংকট যা প্রায়শই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রে উৎপাদন নিয়মিত হয় সামাজিক পরিকল্পনার দ্বারা, ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদন বা অন্য কোন অসংগতি দেখা দেয় না। পুঁজিবাদে উৎপাদনের লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন, আর সমাজতন্ত্রে লোকের চাহিদা পূরণ। পুঁজিবাদে পুঁজির মালিকানা হচ্ছে ব্যক্তিগত এবং সমাজতন্ত্রে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা রয়েছে জনগণের হাতে; পুঁজির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে পুঁজিবাদী সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে ধনিক তথা পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে; আর উৎপাদন যন্ত্রের উপর জনসাধারণের অধিকার থাকার ফলে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবী জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উৎপাদন যন্ত্রের সামাজিক মালিকানা ঃ

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল উৎপাদন যন্ত্রের উপর সামাজিক মালিকানা অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক কোন ব্যক্তি-বিশেষ নয়, পরন্ত সকল শ্রমজীবী জনগণ আধুনিক যুগের উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের সাথে এই সামাজিক মালিকানা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য প্রায় সব সমাজতান্ত্রিক দেশে দু'ধরনের সামাজিক সম্পত্তি আছে :

(১) রাষ্ট্রীয় বা সমগ্র জনগণের সম্পত্তি—পুঁজিপতিদের সম্পত্তির সমাজতান্ত্রিক জাতীয়করণের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছিল, এবং (২) সমবায় সম্পত্তি অর্থাৎ কৃষক বা কারিগরদের সমবায় সংস্থার সম্পত্তি, যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে যৌথ খামার ; সমবায় সম্পত্তির সদস্যগণই সমবায়ের সম্পত্তির মালিক।

সমাজতান্ত্রিক সমবায় সম্পত্তি ঃ

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালে গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করেই সমবায় সম্পত্তির সৃষ্টি হয়। রাশিয়ার পশ্চাদ্‌পদ কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের সম্মতি অনুসারেই স্থাপিত হয়েছিল যৌথ খামার-সমূহ। যৌথ খামারে বিপুল পরিমাণ জমিতে একত্রে চাষ হয়, ফলে আধুনিক যন্ত্র ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারকে কাজে লাগান সম্ভব হয়। যৌথ খামারের মূল উৎপাদন যন্ত্র, যথা, লাঙল ইত্যাদি, ভারবাহী পশু, বীজধান, সার, দালানকোঠা ইত্যাদি খামারের সাধারণ সম্পত্তি। জমি যদিও

রাষ্ট্রের তথা সমগ্র সমাজের সম্পত্তি, প্রত্যেকটা খামারকে পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি বিনামূল্যে চিরকাল ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়। সমবায়ী কৃষকের উপার্জনের প্রধান অংশ আসে যৌথ খামার থেকে; তবে প্রত্যেক কৃষকের নিজস্ব জমিও খানিকটা পরিমাণ থাকে, সেখানে তারা শাকসব্জি বা ফলের গাছ লাগায়, গরু, ভেড়া, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি পোষে। নিজের জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি সাধারণত কৃষক নিজেই ব্যবহার করে তবে বাড়তি কিছু থাকলে সে তা বাজারে বিক্রি করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ঃ

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিই মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। কারণ প্রথমতঃ অর্থনীতির মূল শাখাসমূহ, যথা সমুদয় ভারী শিল্প, যানবাহন (রেল, মটর, বিমান, ষ্টিমার, জাহাজ), ব্যাংক, বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, সংযোগ ব্যবস্থা (ডাক, তার, টেলিফোন, রেডিও, টি. ভি), শহর ও শিল্পাঞ্চলের বাসভবন, খনি সংলগ্ন জমি, বন, জলপথ, রাষ্ট্রীয় খামার ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন যন্ত্রের সামাজিকীকরণের দিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি সমবায় সম্পত্তির চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে সামাজিক গুণসম্পন্ন; কারণ সমবায় সম্পত্তি সমবায় সমিতির সদস্যদের তথা জনসাধারণের একটি ক্ষুদ্র দলের যৌথ সম্পত্তি আর রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হল সমাজের সব সদস্যের, সমগ্র জনগণের সম্পত্তি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় সমবায় সম্পত্তি উভয়ই সমাজ-তান্ত্রিক সম্পত্তির অন্তর্গত। রাষ্ট্রীয় সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী এবং সমবায় সংস্থায় কর্মরত কৃষক বা কারিগর সমান ভিত্তিতেই কাজ করে, উৎপাদন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে এবং কাজের পরিমাণ ও গুণ

হিসাবে পারিশ্রমিক বা বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। অধিকন্তু সমবায়ী কৃষক বা কারিগর শুধু সমবায় সম্পত্তির মালিক নয়, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মালিকও তারা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উপরোক্ত দু'ধরনের সামাজিক সম্পত্তির অনুরূপ দু'ধরনের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি আছে : রাষ্ট্রায়ত্ত (কল-কারখানা, রাষ্ট্রীয় খামার ইত্যাদি) এবং সমবায় অর্থনীতি (যৌথ খামার, যৌথ কারিগরি সংস্থা)। এ-দুই ধরনের অর্থনীতি এবং প্রত্যেক ধরণের অভ্যন্তরস্থ অর্থনীতি-সমূহ পরস্পরের সাথে সমাজতান্ত্রিক পণ্য মুদ্রা সম্পর্ক দ্বারা যুক্ত, যে সম্পর্কটি পুঁজিবাদী পণ্য মুদ্রা সম্পর্ক থেকে গুণগতভাবে পৃথক এবং বিশেষভাবে সমাজ-তান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক মালিকানা প্রবর্তনের ফলে শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে সমাজের শ্রেণীবিভাগ বিলুপ্ত হয় এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান ঘটে ; তার স্থানে দেখা দেয় মানুষে মানুষে পারস্পরিক সাহায্য ও মিত্রসুলভ সহযোগিতাপূর্ণ উৎপাদন সম্পর্ক যা নাকি পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক, প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন সম্পর্ক থেকে গুণগতভাবে পৃথক এবং অনেক মহান ও উচ্চ পর্যায়ের।

একটা বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করার জন্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাজতন্ত্রে সামাজিক সম্পত্তির প্রাধান্য স্থাপিত হলেও তা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সূচিত করে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, রেফ্রিজারেটর, টি, ভি, রেডিও, বইপত্র মোটরগাড়ী, সাইকেল ইত্যাদি যাবতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার অধিকার সব মানুষের থাকে। গ্রামাঞ্চলে এবং ক্ষেত্রবিশেষে শহরেও নাগরিকরা

বাড়ী, ঘর, হাঁস-মুরগী, পশু এবং যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারের মালিক হতে পারে। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে না, সমাজতন্ত্র উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা দূর করে। কারণ এটাই হল অন্যের পরিশ্রমের ফলকে আত্মসাৎ করে তাকে শোষণ করার মূল উৎস এবং এটাই যথার্থ বিধি। জে বি এস হলডেন যেমন বলেছেন, একজন একটা কলমের মালিক হতে পারবে বলে আরেকজনকে লণ্ডন শহরের মালিক হওয়ার অধিকার দিতে হবে এমন কোন কথা নেই।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি :

মানুষ যে সব যন্ত্রপাতি ও কারিগরি কৌশল সহযোগে পরিশ্রম করে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে তাকেই সমগ্রভাবে বলা হয় সমাজের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি। বলা বাহুল্য এক এক ধরণের সমাজ ব্যবস্থায় এক এক রকম বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি থাকে। কারণ, সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা, উৎপাদিত বস্তু দ্বারা নয়। যেমন, মানুষ বহুকাল থেকে ভাত, আটা, ময়দা, কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু এর মধ্যে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে একাধিক বার। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনই এর কারণ। মার্ক্স যেমন বলেছেন, 'জলচালিত কল আমাদের দেয় (ইউরোপীয়) সামন্ত সমাজ আর বাষ্প-চালিত কল আমাদের দেয় পুঁজিবাদী সমাজ।'

বস্তুত, সমাজ বিকাশের মূল কথা হচ্ছে, সমাজের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তির বিকাশ।

আধুনিক পুঁজিবাদের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি হচ্ছে বৃহদায়তন যন্ত্র-শিল্প এবং বিদ্যুৎ শক্তির ব্যাপক ব্যবহার। কিন্তু পুঁজিবাদ অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে যন্ত্র প্রয়োগ করে না এবং সম্ভব হলে মজুর খাটিয়ে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। একথা অবশ্য ঠিক যে, সামন্তবাদের চেয়ে পুঁজিবাদ অনেক বেশী বিস্তৃত ও উন্নত বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এ ভিত্তির বলেই পুঁজিবাদ সামন্তবাদের চেয়ে শ্রমের উৎপাদন-শীলতা অনেক বেশী বৃদ্ধি করতে পেরেছে এবং সামন্তবাদকে পরাহত করতে সক্ষম হয়েছে।

অনুরূপভাবে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করেই সমাজ-তন্ত্র পুঁজিবাদকে পরাস্ত করতে পারবে। গায়ের জোরে বা বিপ্লবী বুলি দিয়ে পুঁজিবাদকে নির্মূল করা যাবে না। সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে শুধু শোষকশ্রেণীকে উৎখাত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলেই চলবে না, পুঁজিবাদের চেয়ে কম খরচে উন্নতমানের অধিক পরিমাণ বস্তু উৎপাদন করে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এ জন্য প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রশিল্পের ভিত্তিতে কৃষিসহ অর্থনীতির সকল শাখাকে পুনর্গঠিত করা। তাই সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি হচ্ছে, শিল্প, কৃষি, নির্মাণকার্য ও অর্থনীতির সকল শাখায় বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের নিয়োগ।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তিতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের দ্বারা। বড় বড় স্বয়ংচল যন্ত্র এবং কারখানা চলতে পারে শুধু বিদ্যুতের সাহায্যে। পশু পালনের ক্ষেত্রে গরুর দুধ দোয়া, ভেড়ার লোম কাটা, জল সরবরাহ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব শুধু বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে। আধুনিক যানবাহন ও সংযোগ ব্যবস্থা বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার ছাড়া অকল্পনীয়।

বস্তুত, সমগ্র অর্থনীতির কারিগরি ভিত্তির পুনর্গঠনে বিদ্যুতের একটি মৌলিক ভূমিকা আছে। সে কারণেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের অন্যতম শর্তই হচ্ছে বৈদ্যুতিকীকরণের হার হতে হবে অর্থনীতির অন্য সব অংশের চেয়ে বেশী। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সকল অর্থনীতির উন্নয়নের মূলে আছে এই বিদ্যুৎশক্তি। লেনিন যেমন বলেছেন, 'সাম্যবাদ হল সোভিয়েত (বা জনগণের) শাসন যোগ বৈদ্যুতিকীকরণ।' সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদ্যুৎশক্তির বিকাশের হার দেখলে এ সম্পর্কে আর সন্দেহ থাকে না: সোভিয়েতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোটামুটি পরিমাণ ১৯১৩ সালে ছিল ১৯০ কোটি, ১৯৪০ সালে ৪৮০০ কোটি এবং ১৯৬৮ সালে ৬৩,৮০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা।

ভারী যন্ত্র শিল্প, ইস্পাত ও রাসায়নিক শিল্প সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তিতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এ সব শিল্প থেকেই কৃষি ও হাল্কা শিল্পের প্রয়োজনীয় উৎপাদন যন্ত্র আসে। এ কারণেই ভারী শিল্প, বিশেষতঃ তার প্রধান শাখাসমূহ সমাজতান্ত্রিক দেশে অগ্রাধিকার লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে মোট শিল্পোৎপাদন বেড়েছে ৬৬ গুণ, তার মধ্যে যন্ত্র ও ধাতুশিল্প বেড়েছে ৫৩৮ গুণ, রাসায়নিক শিল্প ২৯৪ গুণ, সিমেন্ট শিল্প ৪৫ গুণ এবং ইস্পাত শিল্প সাড়ে বাইশ গুণ।

একই সময়ের মধ্যে ভারী শিল্পের বিকাশের ফলে হাল্কা শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ গুণ এবং খাদ্যশিল্প প্রায় ১৩ গুণ।

কৃষি ক্ষেত্রে বৃহদাকার যৌথ চাষ প্রবর্তন, যন্ত্র প্রয়োগ এবং কৃষি বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারসমূহের প্রয়োগই সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি নির্মাণ করে। ১৯৬৭ সালে সোভিয়েতে কৃষি কাজে ১১ লক্ষ জনের

লাঙল ও সাড়ে পাঁচ লক্ষ ফসল কাটার যন্ত্র নিয়োজিত ছিল। সোভিয়েত আমলে কৃষিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার অভাবিত রকম বৃদ্ধি পেয়েছে; এখন সেস্থানে গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনের কাজে ছাড়াও সব বাড়ীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় গৃহকাজের জন্য।

সংক্ষেপে এই হল সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি। আমাদের মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়তে হলে এমন করেই তার বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে। শুধু বক্তৃতা দিয়ে সমাজতন্ত্র হয় না, বিপ্লবী বক্তৃতা দিয়েও না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক সমন্বিত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তার বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে। এ বাস্তব কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে সমাজতন্ত্রের ধারণা আমাদের দেশে কেবল একটা বিমূর্ত ধারণাই হয়ে থাকবে, মানুষের বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ বৃদ্ধির শক্তিমান হাতিয়াররূপে কোনদিনই আত্মপ্রকাশ করবে না।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য : উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি :

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ফলে উৎপাদনের লক্ষ্য আমূল পরিবর্তিত হয়। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শোষণ করে মুনাফা অর্জনই উৎপাদনের লক্ষ্য।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতি নেই। এ সমাজে শ্রমজীবি জনগণই উৎপাদন যন্ত্রের মালিক এবং সমাজের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে মেহনতী জনগণ উৎপাদন করেন। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অবিরাম উন্নতি ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জনগণের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ।

এভাবে সমাজতন্ত্র উৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী নৈরাজ্য দূর করে সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য পরিকল্পনা মাফিক উৎপাদন করে। শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক সম্পদ ও সাংস্কৃতিক মান বৃদ্ধির মানসে অনবরত উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত ও সম্প্রসারিত করে। এটাই সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম।

জনগণের বৈষয়িক মানোন্নয়নের একমাত্র পন্থা হচ্ছে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। কারণ পরশ্রমজীবীদের শোষণের অবসান ঘটিয়ে এবং দেশের সকল শ্রমশক্তি কাজে লাগিয়ে কিছুটা বৈষয়িক মানোন্নয়ন সম্ভব হলেও বিরামহীন মানোন্নয়ন তা দিয়ে সম্ভব হয় না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই অনবরত উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমেই উন্নত করা চলে। কয়েকটা কারণে এটা সম্ভব হয়।

প্রথমতঃ সমাজতন্ত্রে উৎপাদক শ্রেণী তথা শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন যন্ত্রের যৌথ মালিক এবং সে কারণে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারেরও মালিক। ফলে, নিজেদের এবং সমাজের জন্য তারা পরিশ্রম করে বলে শ্রমের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পুঁজিবাদী সমাজের থেকে মূলগতভাবে পৃথক ; সমাজতন্ত্রে শ্রমিকরা শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করে। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক যন্ত্রেরই অংশমাত্র আর সমাজতান্ত্রিক সমাজে সে তার মনিব, তাই এ সমাজে উৎপাদন বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমিকের সৃজনশীল ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়তঃ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিকল্পনা মাফিক পরিচালিত হয় বলে এতে অর্থনৈতিক সঙ্কট বা বিপর্যয় ঘটে না।

তৃতীয়তঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজে যান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটলে তাতে পুঁজিবাদের বেকারের সংখ্যা বাড়ে না, বরং শ্রমিকের কাজের চাপ কমে, বিশ্রামের সময় বাড়ে। তাই পুঁজিবাদী সমাজে প্রবণতা হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ স্থগিত রাখা আর সমাজতন্ত্রের প্রবণতা হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।
চতুর্থতঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই বলে তাদের মধ্যে হীন প্রতিযোগিতা নেই, উৎপাদন কৌশল গোপন করার প্রবণতাও নেই। পুঁজিবাদী সমাজে নতুন যান্ত্রিক আবিষ্কার ঘটলেও প্রভাবশালী পুঁজি-পতিরা সেটা সমাজের ক্ষতি করে হলেও ব্যক্তিগত লাভের জন্য গোপন রাখে বা অকেজো করে রাখে। তাই একই আবিষ্কারের জন্য পৃথক পৃথক প্রচেষ্টা চলার ফলে অনেক শক্তির অপচয় হয় এবং গোপনীয়তার ফলে অনেক আবিষ্কারের সুফল থেকে সমাজ বঞ্চিত থাকে। যেমন, আমেরিকায় প্রতি বছর বহু সহস্র কারিগরি আবিষ্কার একচেটিয়া পুঁজিপতিরা পেটেন্ট করে ফেলে রাখে; নিজেরাও ব্যবহার করে না, অন্য কাউকে করতেও দেয় না। আরেকটা দৃষ্টান্ত, টাইফয়েড রোগে যখন পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিপন্ন হচ্ছিল, তখনও ক্লোরোমাইসেটিন ওষুধের আবিষ্কারক কোম্পানী তার প্রস্তুত প্রণালী গোপন রেখে একাকী প্রভূত মুনাফা অর্জন করেছে।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বাস্তব তাগিদ এবং তা কার্যকর করার বাস্তব সম্ভাবনা ও দুয়ে মিলে শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিকে সমাজতন্ত্রের মূল নিয়মে পরিণত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের দৃষ্টান্ত তা প্রমাণ করেছে। সমাজতন্ত্রের আমলে সোভিয়েতে শিল্প বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩ গুণ, কৃষি ৫ গুণ। অবশ্য

কয়েকটি বাস্তব কারণে (জার আমলের রাশিয়ার অনুন্নত অর্থনীতি, নাৎসী আক্রমণ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ইত্যাদি) সোভিয়েত ইউনিয়ন এখনও উৎপাদনের দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে পিছিয়ে আছে; কিন্তু এটা একটা সাময়িক পশ্চাদ্‌পদতা এবং অল্পকালের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উৎপাদনের দিক দিয়ে ছাড়িয়ে যাবে, কারণ এখনই সোভিয়েতের শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী।

সমাজতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থা :

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহ জনগণের সম্পত্তি, তাই উৎপন্ন সম্পদেও জনগণের অধিকার বিস্তৃত হয়। নিজেদের শ্রমের ফল শ্রমজীবী জনগণ নিজেরাই ভোগ করে বলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনসাধারণের বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহী হয়।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য হল জনসাধারণ সর্বাঙ্গীন চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে উন্নত কারিগরি বিদ্যা ও সমবেত শ্রমের সাহায্যে অনবরত উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত করা।

আবার বাস্তব সীমাবদ্ধতার কারণে সমাজতন্ত্রে সুপ্রচুর পরিমাণে ভোগ্য পণ্য উৎপাদনও সম্ভব হয় না। ফলে বণ্টনের ব্যবস্থাও হিসেব অনুযায়ী করতে হয়।

আমরা আগেই বলেছি, সমাজতন্ত্রে প্রত্যেকে ক্ষমতা অনুযায়ী পরিশ্রম করে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়। এ নীতি কার্যকর করতে হলে সমস্ত লোকের কাজের হিসাব ও তার উপর সামাজিক

নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা দরকার। কতকগুলো বাস্তব কারণে এ ধরনের হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

প্রথমতঃ পুঁজিবাদী সমাজের চেয়ে উৎপাদনের অনেক বেশী বিকাশ ঘটলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজে সব মানুষের সব রকম প্রয়োজনের পুরো চাহিদা মেটানোর মত পর্যাপ্ত উৎপাদন সম্ভব হয়ে উঠে না।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রম মানুষের পক্ষে তার অস্তিত্বের প্রধান অঙ্গরূপে উপস্থিত হয় না. সাম্যবাদী সমাজে যেমন হবে। সমাজবাদী সমাজে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এত উন্নত পর্যায়ে পৌঁছুলে সে সমাজের কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ আপনা থেকেই উৎসাহের সঙ্গে সামাজিক সৃজনশীল শ্রমে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে সব মানুষকে সামাজিক কল্যাণের জন্য সর্বাধিক উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাদের বৈষয়িক উদ্দীপনা প্রদান করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক স্তর পর্যন্ত শহর ও গ্রামের মধ্যে এবং মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রমীদের মধ্যে পার্থক্য থেকে যায়। সে কারণে বিভিন্ন শ্রমিকের শ্রমের মধ্যে কেবল পরিমাণগত নয়, গুণগত পার্থক্য থাকে। কথাগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা দরকার।

দীর্ঘকালের শোষণযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা মানুষের মনের উপর তার কালো ছাপ রেখে গেছে; সমগ্র সমাজতান্ত্রিক পর্যায় জুড়ে তাই পুঁজিবাদের কুৎসিত ব্যাধিগুলোর বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাতে হয়। যেমন শ্রমজীবী জনগণের অনগ্রসর অংশ সমাজকে যথাসম্ভব কম দিয়ে যত বেশী সম্ভব পেতে চায়; শ্রেণীবিভক্ত সমাজের জবরদস্তি শোষণের ফলশ্রুতি এটা। শ্রমের প্রতি নতুন সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শ্রম এবং পারিশ্রমিকের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তাই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক শ্রমের দিকে আকৃষ্ট করার এই নীতির সংগে পুঁজিবাদী সমাজের জবরদস্তির কোন মিল নেই। পুঁজিবাদী সমাজে শোষক শ্রেণী জনগণকে অনাহারের ভয় দেখিয়ে গায়ে খাটতে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমগ্র সমাজই মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে শ্রম অনুসারে শ্রমিকের পাওনা নির্ধারণ করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সব মানুষের দায়িত্ব রয়েছে কাজ করার। বিনিময়ে সমাজের কাছ থেকে কাজের পরিমাণ ও গুণ হিসাবে ফল পাওয়ার অধিকারও তাদের আছে। শোষণযুক্ত সমাজে যে পরশ্রমজীবী, ধনিকশ্রেণী ও মেহনতী শোষিত শ্রেণী প্রভৃতি শ্রেণীভেদ থাকে, সমাজতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থার ফলে তা লুপ্ত হয়।

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে গণ্য করা হয়। মানুষ সেখানে জীবিকা অর্জনের জন্য শ্রম করে। সমাজতন্ত্রে শ্রম হল সামাজিক শ্রম ; শ্রমকে এখানে ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক বিষয় রূপেই গণ্য করা হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের নাগরিক শ্রমকে শুধু জীবিকারূপেই গণ্য করে না, সেটাকে তার কর্তব্যরূপে, নতুন সমাজ গঠনে তার নিজস্ব অবদানরূপে গণ্য করে থাকে। তাই, বৈষয়িক স্বার্থ ছাড়াও, সমাজতন্ত্রে শ্রমিক ভাবাদর্শগত ও নৈতিক প্রেরণা দ্বারাও শ্রম সাধনে উদ্বুদ্ধ হয়। সেখানে শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। প্রতিযোগিতা বটে, কিন্তু এ প্রতিযোগিতার মূল বৈশিষ্ট্য হল, শ্রমিকের অগ্রগামী অংশ এখানে পশ্চাদপদদের কমরেডসুলভ পন্থায় সাহায্য করে এবং তার ফলে সাধারণ অগ্রগতি সাধিত হয়। এ কারণেই সোভিয়েতে বৈজ্ঞানিক ও

কারিগরি আবিষ্কার অনবরত বেড়ে চলেছে। শ্রমক্ষেত্রে সাবেক জবরদস্তি শৃঙ্খলার স্থানে সমাজতন্ত্রে সচেতন শৃঙ্খলাবোধের উদয় হয়। কারণ সমাজতন্ত্রে শ্রমিক কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থবোধই নয়, সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন থাকে।

সমাজতন্ত্রের আমলেও সাবেক পুঁজিবাদী শ্রম বিভাগের অবশেষসমূহ টিকে থাকে। দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের পার্থক্য ছাড়াও বিভিন্ন শ্রমিকের কাজের দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে কেউ সাধারণ ধরণের শ্রম করে, কেউ জটিল যন্ত্রযোগে সূক্ষ্ম কাজ করে। সকলে আবার পছন্দমত কাজের সুযোগও পায় না, ব্যক্তিগত বা পরিবারের প্রয়োজনে বেশী রোজগারের ও কম পছন্দসই কাজ করতে বাধ্য হয়; অর্থাৎ শ্রম এখন পর্যন্ত জীবিকার প্রয়োজন নির্বিশেষে অস্তিত্বের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গরূপে উদিত হয় নি। আর তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকলে সমান উৎসাহের সাথে কাজ করে না; কেউ কেউ ফাঁকি দিয়ে অন্যের শ্রমে বাঁচতে চায়।

তাই সমাজতন্ত্রে শ্রম ও পারিশ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করতে হয় শ্রমিকের কাজের দক্ষতা ও জটিলতা বিচার করে, ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ ও গুণ হিসেব করে পারিশ্রমিক দিতে হয়। যে বেশী বা ভাল কাজ করে সে বেশী পারিশ্রমিক পায়। এর ফলে, শ্রম সম্পাদনে বৈষয়িক উদ্দীপনা দানের ফলে শ্রমিকরা দক্ষতা অর্জনে উৎপাদন বৃদ্ধিতে, পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে যত্নবান হয়।

সমাজতন্ত্রে জাতীয় উৎপাদনের একটা অংশ জমা হয় সামাজিক ভাণ্ডারে, বাকী অংশ থেকে সকলে যার যার শ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক লাভ করে। সমাজতান্ত্রিক বন্টন নীতিতে শ্রমের পরিমাণ ও গুণ নির্বিশেষে সমান মজুরির

স্থান নেই। সমাজতন্ত্রে সমবণ্টন নীতি অনুসৃত হলে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকের কোন উৎসাহই থাকবে না এবং দক্ষ শ্রমিকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। বস্তুত শ্রম অনুসারে বণ্টনের নীতি সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি সাধন করে। এ ধরনের বণ্টন নীতি সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন শক্তির দ্রুততম বিকাশ নিশ্চিত করে।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশে জীবনযাত্রার মান অবিরাম বেড়েই চলেছে।

উপরোক্ত সামাজিক ভাণ্ডার সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করা দরকার। সমাজতন্ত্রে বেতনের মাধ্যম ছাড়াও আরেকটা পন্থায় বৈষয়িক সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা জনগণের মধ্যে বিতরণ করা। সেটা হল সামাজিক ভাণ্ডার বা জনভোগ্য ভাণ্ডার। সামাজিক ভাণ্ডার থেকে কিণ্ডার গার্টেন, শিশু-নিবাস, বোর্ডিং স্কুল, ছুটি নিবাস, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, পেন্সন, বৃত্তি ইত্যাদির ব্যয়ভার বহন করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, বেতনের পাশাপাশি সামাজিক ভাণ্ডারের আয়তন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

সমাজতন্ত্রে বেতনই মেহনতী জনগণের রোজগারের প্রধান উৎস। কিন্তু সমাজতন্ত্র অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সামাজিক ভাণ্ডারের ভূমিকা বাড়তে থাকে। যেমন ১৯৪০ সালে এ ভাণ্ডার থেকে সোভিয়েত জনগণ পেয়েছে ৪৬০ কোটি রুবল এবং ১৯৬৮ সালে ৫৫০০ কোটি রুবল। সোভিয়েতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি লোক বার্ধক্য ও পঙ্গুত্ব ভাতা পেয়ে থাকেন। সমস্ত জনগণ বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। ব্যাপকসংখ্যক লোক বিনা খরচে বা কম খরচে স্বাস্থ্য নিবাসে থাকার সুযোগ পান। বড় পরিবারের ভরণপোষণের জন্য, মাধ্যমিক ও

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বৃত্তি দানের জন্য, মাতৃমঙ্গলের জন্য বিপুল সম্পদ ব্যয় করা হয়ে থাকে। গৃহ নির্মাণের জন্য প্রচুর ব্যয় করা হয় - গত বার বছরে প্রায় অর্ধেকসংখ্যক জনগণ নতুন বা উন্নততর বাড়ীতে স্থান নিয়েছেন। এ সবের খরচ সামাজিক ভাণ্ডার থেকে আসে।

এখন এ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত বেতনের পরিমাণ সামাজিক ভাণ্ডার থেকে পাওয়া সুযোগ-সুবিধা থেকে অনেক বেশী; তথাপি, সমাজতন্ত্রে এ সামাজিক ভাণ্ডার সমাজ জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থাদি ছাড়াও এ ভাণ্ডার থেকে পাঠাগার, মিউজিয়াম, ক্লাব, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। এ ভাণ্ডারের সাহায্যে জন-সাধারণের মধ্যে অসমতাও অনেক পরিমাণে দূর করা হয়। যেমন, বড় পরিবারগুলো ছোট পরিবারের তুলনায় জনভোগ্য তহবিল থেকে বেশী সাহায্য পায়। সমাজতন্ত্র যত অগ্রসর হবে, জনসাধারণের চাহিদা ততই বেশী পরিমাণে জনভোগ্য তহবিল থেকে পূরণ হবে এবং এক সময় এর মাত্রা ব্যক্তিগত বেতনকে অনেক ছাড়িয়ে যাবে। প্রয়োজন অনুসারে বণ্টনের সাম্যবাদী নীতি তখনই প্রবর্তন সম্ভব হবে যখন শ্রম অনুসারে বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রয়োজনীয়তা লোপ পাবে, অর্থাৎ যখন সমাজে পর্যাপ্ত বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি হবে এবং বৈষয়িক উদ্দীপনা ছাড়াই শ্রম মানুষের অস্তিত্বের এক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গে পরিণত হবে। বস্তুত, শ্রম অনুসারে বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতিই প্রয়োজন অনুসারে বণ্টনের সাম্যবাদী নীতি বাস্তবায়িত করার উপযুক্ত ভিত্তি নির্মাণ করে।"

সমাজতন্ত্রের সামাজিক সম্পর্ক :

উৎপাদনের উপায়সমূহ রাষ্ট্রীয়করণের ফলে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কেও আমূল পরিবর্তন ঘটে। শোষণমুক্ত সমাজে যেমন শ্রেণী, রাষ্ট্র, আইনকানুন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও প্রথা গড়ে উঠেছিল উৎপাদন যন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানার উপর ভিত্তি করে, তেমনি সমাজতন্ত্রেও রাজনৈতিক উৎপাদন যন্ত্রের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে উঠে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্ক।

সমাজতন্ত্রের শ্রেণীবিন্যাস :

সমাজতন্ত্র নির্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শ্রেণীগত অবস্থারও বিপুল পরিবর্তন ঘটে। উৎপাদন যন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত অধিকার এবং মানুষের উপর মানুষের শোষণ বিলুপ্ত হয় এবং শহরে ও গ্রামে পুঁজিপতি, জমিদার প্রভৃতি শোষক শ্রেণীগুলোকে উৎখাত করা হয়। তার স্থানে দেখা দেয় নতুন শ্রেণী কাঠামো।

সমাজতন্ত্রের সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : এ সমাজ শ্রমজীবী জনগণের মিত্রভাবাপন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত এবং এসব শ্রেণীর মৌল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত স্বার্থ এক এবং অভিন্ন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত বিশেষ সহায়ক হবে, কারণ এখানেই সমাজতন্ত্র দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে দুটো বন্ধুভাবাপন্ন শ্রেণী আছে—শ্রমিক শ্রেণী এবং যৌথ খামার কৃষক। এ ছাড়া মেহনতী বুদ্ধিজীবীর সামাজিক স্তরটিও

সেখানে আছে। সোভিয়েত আমলে অবশ্য এদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

সমাজতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদের শোষিত শ্রমিক শ্রেণী নয়। শ্রমিক শ্রেণী সেখানে অবশিষ্ট জনগণের মতই উৎপাদন যন্ত্রের মালিক এবং নিজ দেশের প্রকৃত মালিক। শিল্প বিকাশের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর আয়তনও বাড়ে; সোভিয়েত শ্রমজীবী জনগণের অর্ধেকেরও বেশী শ্রমিক। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকদের দক্ষতা এক, কারিগরি ও সাংস্কৃতিক মানও উন্নত হয় এবং তাদের শ্রমের প্রকৃতি ও তাৎপর্যও পরিবর্তিত হয়। সোভিয়েতের শ্রমিকদের অধিকাংশ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। এর ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শ্রমিকদের সামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়েছে। জটিল যন্ত্রচালন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত শ্রমিকদের শ্রম ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের শ্রমের তুল্য হয়ে উঠেছে।

সমাজতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণীই সমাজের অগ্রগামী অংশ। এ শ্রেণীর নেতৃত্বেই শোষক শ্রেণী নির্মূল হয়েছিল এবং সমাজতন্ত্র নির্মিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রে মূল বৈষয়িক ভিত্তি তথা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণীই সবচেয়ে অগ্রগামী ও সংগঠিত অংশরূপে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং অন্যান্য শ্রেণীর সাথে সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়।

সমাজতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য হচ্ছে শ্রেণীভেদ বিলোপ করে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলা। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণী একদিকে যেমন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, অপরদিকে তেমনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তা থেকে মুক্ত ও পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমজীবী জনগণের সাথে ঐক্য গড়ে তুলতে আগ্রহী। এর কারণ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদীরা নিজ শ্রেণী স্বার্থে

উৎকট জাতীয়তাবাদ ও পরজাতি বিদ্বেষ প্রচার করে এবং তা পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণকে প্রভাবিত করে ; ধনতান্ত্রিক দেশে একমাত্র সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিতেরাই এ ক্ষতিকর ভাবাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

কৃষকদের অবস্থাও সমাজতন্ত্রে আমূল পরিবর্তিত হয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কৃষকেরা জমিদার জোতদারের শোষণের ফলে পদানত, বিচ্ছিন্ন জনতা-রূপেই বিরাজ করে ; কিন্তু সমাজতন্ত্রে এরা প্রকৃত মুক্ত শ্রেণীরূপে, শ্রমিক শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য মিত্র শ্রেণী ও একটি সক্রিয় সামাজিক শক্তিরূপে উদিত হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য যৌথ শ্রম কৃষকদের শতাব্দী পুরাতন বিচ্ছিন্নতা দূর করেছে এবং জমির মালিকানা ভিত্তিক সম্পত্তি জ্ঞান ও সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারা দূর করে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে এক সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী।

সোভিয়েতে কৃষকদের দক্ষতা, শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতির মান উন্নত হয়েছে। কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ফলে কৃষকদের যন্ত্রচালনায় প্রশিক্ষণ দান করতে হয়েছে এবং তার ফলে কৃষি ও শিল্প শ্রমিকেরা নিকটতর হয়েছে। গ্রামের চেহারাও বদলে যাচ্ছে। আধুনিক যন্ত্রচালনা ও কৃষি পদ্ধতি আয়ত্ত করে কৃষকেরা নিজেদের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছে এবং গ্রামের জীবনযাত্রার ধরনেও পরিবর্তন আনছে। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সাথে-সাথে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান এভাবে ধীরে ধীরে কমে আসছে।

সমাজতন্ত্রে বুদ্ধিজীবিদের চরিত্রও আমূল পরিবর্তিত হয়। সোভিয়েতের বুদ্ধিজীবীরা যেমন তারা শ্রমিক-কৃষকের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয় এবং জন-গণের প্রতিই অনুগত থাকে।

সমাজতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতির কারণ ও বিজ্ঞান একটি প্রত্যক্ষ উৎপাদন শক্তিতে পরিণত হওয়ার ফলে সেখানে বুদ্ধিজীবীদের

ভূমিকাও ক্রমেই অধিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। শিল্প ও বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের ফলে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমাজতন্ত্র বুদ্ধিজীবীদের সৃজনশীল কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করার এবং তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কারিগরি অগ্রগতি সাধন, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, উৎপাদন পরিচালনা, তরুণদের শিক্ষাদান, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশ সাধন প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের নতুন শ্রেণী-বিন্যাস সমগ্র শ্রেণী সম্পর্ককে আমূল পরিবর্তিত করে। সমাজতন্ত্র মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের পুরোপুরি অবসান ঘটিয়ে বহু সহস্র বছরের পুরাতন শ্রেণীভেদ ও শ্রেণী শোষণের বিলোপ সাধন করে। ফলতঃ সমাজতন্ত্রে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর অস্তিত্ব লোপ পাওয়ায় শ্রেণী সংগ্রাম সেখানে অনুপস্থিত।

উৎপাদন সম্পর্কের বিচারে বা রাষ্ট্রযন্ত্রের ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার কর্তব্য ইত্যাদির বিচারে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সব শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের মানুষই সমান অধিকার বিশিষ্ট। কোন মানুষই সেখানে উৎপাদন যন্ত্রকে আত্মকবলিত করতে পারে না বা তাকে অন্যদের শোষণ করার কাজে ব্যবহার করতে পারে না।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, সমাজতন্ত্রে শ্রেণীসমূহ বিলুপ্ত না হলেও তাদের চরিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়। বস্তুত, শোষণ-যুক্ত সমাজের ক্ষেত্রে যে অর্থে আমরা শ্রেণী শব্দটা ব্যবহার করি সে অর্থে কথাটা সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সমাজতন্ত্রে বিদ্যমান শ্রেণীর কথা বলতে আমরা বুঝিয়েছি শ্রমজীবী জনগণেরই সম-অধিকার বিশিষ্ট বিভিন্ন দলের কথা; এদের মধ্যে পার্থক্যের কারণ উৎপাদন

সম্পর্কের বিভিন্নতা নয়, শোষক ও শোষিত শ্রেণীর অবস্থিতি নয়, পরন্তু একই সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির বিভিন্ন রূপই (যথা, রাষ্ট্রীয় সমবায়, যৌথ খামার সম্পত্তি) উক্ত বিভিন্ন দলের অস্তিত্বের কারণ। এ সামাজিক পার্থক্য একই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিয়োজিত মানুষের পার্থক্যই শুধু প্রতিফলিত করছে।

তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীদের মধ্যে সম্পর্ক পুঁজিবাদী আমলের চেয়ে মূলগতভাবে পৃথক। সমাজতন্ত্রে শ্রেণীদের সম্পর্ক শত্রুতা-মূলক নয় এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাথে সাথে এ শ্রেণীগত পার্থক্যও কমে আসে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায়। উল্লেখ্য যে, পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক বিভেদ না কমে বরং বেড়েই চলে এবং সামাজিক অন্যায় দিন দিন প্রকটতর হয়।

আবার, ধনবাদী সমাজে শ্রেণীভেদ মানুষের জীবনকে যেমন প্রভাবিত করে, সমাজতন্ত্রে তেমন করে না। ধনতান্ত্রিক দেশে কেউ বড় ঘরে জন্মালে তার শিক্ষালাভের সুযোগ, বড় চাকরি, সামাজিক সম্মান ইত্যাদি সুনিশ্চিত হয়ে থাকে—তার জ্ঞান, বুদ্ধি, অধ্যবসায় থাকুক আর নাই থাকুক। অপরপক্ষে মজুরের ঘরে কেউ জন্মালে সে মানুষ হওয়ার বা দারিদ্র্য, অশিক্ষা, শোষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথই পায় না। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষের অবস্থান নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপর, তার সামাজিক উৎসের উপর নয়।

যেমন, রোজগারের প্রশ্নটা বিচার করা যাক। সমাজতন্ত্রে জীবন-যাত্রার মানের তারতম্যের শ্রেণী চরিত্র ক্রমেই লোপ পাচ্ছে অর্থাৎ সেখানে শ্রমিকরা কম বেতন পাবে, বৈজ্ঞানিক বা ইঞ্জিনীয়ার বেশী পাবে এমন কোন কথা নেই। সমাজতন্ত্রের অনেক শ্রেণীর শ্রমিক (যেমন, খনি

বা ধাতু শ্রমিক) অনেক বুদ্ধিজীবীর থেকে বেশী রোজগার করে ; অনেক যৌথ খামার কৃষক কারখানা শ্রমিক বা অফিস কর্মচারীর চেয়ে বেশী উপার্জন করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্মান, প্রতিপত্তি ও খ্যাতি কোন বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া নয় ; যে কোন ব্যক্তি যে কোন ক্ষেত্রে সমাজের উপকারার্থে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করলে পুরস্কৃত হবেন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে যেটুকু শ্রেণী বিভাগ আছে তাও খুব দৃঢ় বা প্রকট নয়। ব্যবধান যে শুধু শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যেই কম তাই নয় দৈহিক পরিশ্রমীদের সাথে বুদ্ধিজীবী বা মানসিক পরিশ্রমীদের মধ্যেও খুব উঁচু বেড়া নেই। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকেরা শ্রমিক ও কৃষক পরিবার থেকেই বেশী সংখ্যায় আসে। এবং আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষিত লোকেরা এসে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর আয়তন স্ফীত করে তোলেন।

একথা বলাই বাহুল্য যে, সমাজতন্ত্রে কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করতে হলে মানুষকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে এবং কাজ শিখতে হবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে উচ্চ শিক্ষার শ্রেণীচরিত্র লোপ পায়, অর্থাৎ সেখানে উচ্চ শিক্ষার অধিকার বিশেষ কোন উচ্চ শ্রেণীর কুক্ষিগত নয় গৃহের উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশ, অবসর, অধ্যয়নের অনুকূল বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি কোন বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া নয় এবং সকলের সাধ্যায়ত্ত বলে সমাজতন্ত্রে শিক্ষাদীক্ষা লাভের সুযোগ সকলের পক্ষেই প্রায় সমান।

বস্তুতঃ, সমাজতন্ত্রে শ্রেণী সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে : সকলের জন্য সমান সুযোগ, শ্রেণী বিভাগের ক্রমিক অবসান, পূর্ণ সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাই জনগণের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্য বিরাজ করে। শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবীর মূল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের অভিন্নতাই এ ঐক্যের মূলে কাজ করছে। সে অভিন্ন লক্ষ্য হল নিরন্তর সমাজ বিকাশের মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ, যে সমাজ তাদের জীবনকে বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদে পূর্ণ করে তুলবে।

সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক সংগঠন :

ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে রাষ্ট্র যে চরিত্র নেয় মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা তার নাম দিয়েছেন 'সর্বহারার (শ্রমিকশ্রেণীর) একনায়কত্ব। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত এবং শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের উদ্ভব ঘটায়। এটা এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এর পূর্ববর্তী সব রাষ্ট্র ব্যবস্থাই ছিল শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার, শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ করার যন্ত্রবিশেষ। অপরপক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব হল এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে শ্রমিক শ্রেণীই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী, যে ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী সকল মেহনতী জনগণের সহযোগিতায় পুঁজিবাদীকে ধ্বংস করে শোষকমুক্ত. শ্রেণীহীন নতুন সমাজ গড়ে তোলে।*

"শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব" একটা দার্শনিক রাজনৈতিক পারিভাষিক শব্দ। প্রচলিত অর্থে একনায়কত্ব বলতে যা বোঝায় তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। পুঁজির শাসনকে নির্মূল করা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ এবং শ্রেণী বিভাগের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের সংগ্রামে মেহনতী এবং শোষিত জনগণকে পরিচালিত করতে পারে একমাত্র

সুগঠিত শ্রমিক শ্রেণী ; এ শ্রমিক শ্রেণীর নায়কত্বের পরিচালিত রাষ্ট্রের নাম শ্রমিক শ্রেণীর নায়কত্ব। এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল কাজ হল: ক্ষমতাচ্যুত ধনিক শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা জনগণের হাতে সমর্পণ করা এবং জনগণের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করে বিপ্লবলব্ধ ফলসমূহকে রক্ষা ও সুরক্ষিত করা ; সমাজতান্ত্রিক সমাজ, অর্থনীতি গড়ে তোলা ও জনগণকে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় শিক্ষিত করে তোলা। বস্তুত, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের কাজই হল শ্রমজীবী জনগণের জন্য পূর্ণ গণতন্ত্র নির্মাণ করা।

সর্বহারার একনায়কত্ব এক নতুন এবং উচ্চতর পর্যায়ের গণতন্ত্র ; ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ধনিক শ্রেণী, মেহনতী জনগণ কেবল নামেই গণতান্ত্রিক অধিকারের মালিক। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় অধিকাংশ মানুষই যে ক্ষেত্রে অনাহার, অশিক্ষা, বেকারত্বের শিকার, সে ক্ষেত্রে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলা পরিহাস মাত্র ; অপরপক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব অধিকাংশ জনগণের জন্য গণতন্ত্র নিয়ে আসে, গণতন্ত্র আসে না শুধু শোষকদের জন্য। সর্বহারার একনায়কত্ব পরিচালিত হয় শুধু শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। ফলত 'সর্বহারার একনায়কত্ব' এবং 'শ্রমজীবীদের গণতন্ত্র' কথা দুটো একই অর্থ প্রকাশ করে।

সর্বহারা একনায়কত্ব পরিচালিত হয় সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে। বেসরকারী বলতে বোঝায় কমিউনিষ্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব কমিউনিষ্ট লীগ, সমবায় সমিতি, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সমিতি, লেখক সমিতি, শিল্পী সমিতি ইত্যাদি গণসংগঠন—এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র হল কমিউনিষ্ট পার্টি, এ পার্টিই সমাজতন্ত্রের নির্মাণকার্য পরিচালনা করে। সমাজ বিকাশের নিয়ম জানা থাকায় কমিউনিষ্ট

পার্টিই পারে রাষ্ট্রীয় ও জনসংগঠনসমূহের মাধ্যমে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করতে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কালে পার্টির সাথে জনসাধারণের যে সংযোগ স্থাপিত হয় তারই মাধ্যমেই ক্রমশ পার্টির সাথে জনগণের দৃঢ় ঐক্য গড়ে উঠে। সমাজতন্ত্র নির্মাণের পক্ষে পার্টি ও জনগণের এ ঐক্য অপরিহার্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক অংশের অভিজ্ঞতা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে একটি বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ বা পূর্ণ সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকা :

এখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের সংগ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা ব্যাখ্যা করলে পূর্বাপর বক্তব্য বুঝতে সুবিধা হবে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা মার্কসবাদ লেনিনবাদ মানবসমাজের বিকাশের ধারার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার নিয়মসমূহ আবিষ্কার করেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব একথা বলে না যে কোন বিমূর্ত নিয়মের বলে, মানুষের সক্রিয় প্রচেষ্টা ছাড়াই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মানব সমাজের বিকাশের বাস্তব নিয়ম অর্থাৎ বাস্তবে ক্রিয়াশীল নিয়মকে সূত্রাকারে উপস্থিত করেছে মাত্র। এবং এ বাস্তব নিয়মের একটা মূলসূত্র হল, শ্রমজীবী জনগণ তাঁদের উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কর্ম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের বিকাশ ঘটান।

সমাজ বিকাশের নিয়ম তাই আপনা থেকেই বা অবধারিত ভাবে সমাজ-তন্ত্রের উদয় ঘটায় না। শ্রমিক শ্রেণী এবং সমগ্র শ্রমজীবী জনগণ যদি

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নিয়মসমূহ আয়ত্ত ও প্রয়োগ করতে শেখে, তাহলেই কেবল সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব।

শ্রমিক শ্রেণীকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হলে অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মানসে নিজ সংগঠিত শ্রেণীশক্তির সাহায্যে পুঁজিবাদী শ্রেণীকে উৎখাত করতে হলে এবং এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পন্থার সংগ্রামের কৌশল আয়ত্ত করতে হলে তাকে সমাজ বিকাশের নিয়ম এবং শ্রেণী সংগ্রামের জটিল প্রক্রিয়াসমূহ ভালভাবে শিখতে হবে। এর একমাত্র পথ হচ্ছে সমাজবিকাশের স্বার্থ তথা শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ যে বিপ্লবী তত্ত্বে প্রতিফলিত সেই মার্কসবাদ লেনিনবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব আয়ত্ত করা।

বাইরের সাহায্য ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন কেবল স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হতে পারে। শ্রমিকদের শ্রেণী সচেতন ও সংগঠিত করতে হলে তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে এমন ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে যেন তা তাদের মনকে পুরোপুরি আকৃষ্ট করতে পারে।

শ্রমিকরা জীবন রক্ষার প্রয়োজনে প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামে নিমগ্ন থাকে বলে এবং পুঁজিপতিরা তাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে বলে তাদের পক্ষে নিজ উদ্যোগে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন সম্ভব হয় না। এ কারণেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের আবিষ্কার ঘটেছিল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ অবলম্বনকারী পণ্ডিতবর্গের হাতে। এ তত্ত্বের আবিষ্কারের পর তাকে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল, যাতে করে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু এ কাজ খুবই দুরূহ। স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন সর্বদা প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক দাবীতে গড়ে ওঠে বলে তার

পরিবর্তন ঘটিয়ে সামগ্রিক শ্রেণীস্বার্থমূলক ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ঘটানো কঠিন কাজ। তা ছাড়া, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রাধান্য থাকে বলে শ্রমিকশ্রেণীও এ ভাবাদর্শের খপ্পর থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

এ সকল সম্পন্ন করার জন্য অর্থাৎ, শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের বিস্তার সাধন, শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করা, ঐ সংগ্রামকে পরিচালিত করা এবং ধনতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক দেশে একটি করে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি তথা মার্কসবাদী পার্টি থাকা আবশ্যক। মার্ক্সবাদী পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব এবং বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে মিলন ঘটায়। শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব পার্টি তথা মার্ক্সবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদ ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে পারে। একারণেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আবিষ্কর্তাদ্বয় দীর্ঘকাল পরিশ্রম করে কমিউনিষ্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করেন এবং লেনিন মার্কস এঙ্গেল্স্-এর চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয়ে মার্ক্সবাদী পার্টির তত্ত্বকে পূর্ণতা দান করেন এবং বলশেভিক পার্টিকে সে ভিত্তিতে গড়ে তোলেন, যে পার্টি রুশ সাম্রাজ্যে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ভাল করে উপলব্ধি করা দরকার, কমিউনিষ্ট পার্টি বা মার্কস্বাদী লেনিনবাদী পার্টি বলতে কি বুঝায়। কারণ, পৃথিবীর ব্যাপক জনগণের মধ্যে মার্ক্সবাদী বিপ্লবী তত্ত্বের সম্মান বৃদ্ধি পাওয়ায় আজকাল অনেক দেশেই প্রতিক্রিয়াশীলরা ও গণস্বার্থবিরোধীরা মার্কস্বাদের আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে থাকে। এ ছাড়া অনেক বিপদগামী সৎ ব্যক্তিরাও মার্ক্সবাদের নাম ব্যবহার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। লেনিন দেখিয়েছেন যে কমিউনিষ্ট পার্টি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে প্রগতি-

শীল ও শ্রেণী সচেতন এবং সবচেয়ে সংগঠিত অগ্রবাহিনী, যে বাহিনী শ্রমিক শ্রেণী এবং অপরাপর ব্যাপক সংখ্যক মেহনতী জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এ পার্টির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পুঁজিবাদ ও ধনতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা, সুগভীর বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী, কথা ও কাজের সঙ্গতি, সর্বপ্রকার শোষণের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী তত্ত্ব ও বিপ্লবী সংগ্রামের সংযুক্তি সাধন।

শুধু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার ক্ষেত্রেই নয়, সমাজতন্ত্র নির্মাণেও কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের অগ্রবাহিনীরূপে কাজ করে থাক। সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে এবং সাম্যবাদের পথে অগ্রসর হওয়ার ফলে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের জটিল সমস্যার সমাধানে সর্বহারার একনায়কত্ব যাতে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত পথে অগ্রসর হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করে এই কমিউনিষ্ট পার্টি। শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত কমিউনিষ্ট পার্টি দলের বাইরের জনগণের সাথেও গভীর সংযোগ রক্ষা করে। ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণ যাতে সমাজতন্ত্র নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তার নিশ্চয়তা বিধান করে কমিউনিষ্ট পার্টি। সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমগ্র মেহনতী জনগণের ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে সংহত করার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব অপরিহার্য।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব সংসদীয় (পার্লামেন্টারী) পদ্ধতি এবং কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলকে ধ্বংস করে বলে পুঁজিবাদের প্রচারকরা প্রচার করে থাকে। কিন্তু কথাটা মোটেই সত্য নয়। পরন্তু, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব সংসদীয় পদ্ধতিকে উন্নীত ও রূপান্তরিত করে

তাকে শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃত ক্ষমতার হাতিয়ারে পরিণত করে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে কমিউনিষ্ট পার্টি নেতৃত্বদান করলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী অন্য দল ও সংগঠনের সহযোগিতা সে পরিহার করে না। অবশ্য, কোন দেশে সর্বহারার একনায়কত্ব কি শাসনতান্ত্রিক রূপ নেবে তা নির্ভর করে ঐ দেশের বিশেষ অবস্থার ওপর। সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারার একনায়কত্ব শ্রমজীবী জনগণের সোভিয়েত সংসদ-এর রূপ গ্রহণ করেছে আবার অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে এটা রূপ নিয়েছে জনগণ-তন্ত্রের। সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে একটাই রাজনৈতিক দল—কমিউনিষ্ট পার্টি। কিন্তু অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কমিউ-নিষ্ট পার্টি ছাড়া আরও কয়েকটি দল থাকে যারা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা মেনে নেয় এবং এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণে পার্টির সাথে সহযোগিতা করে। উল্লেখযোগ্য যে, প্রথমাবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একমাত্র শ্রমিক রাষ্ট্র এবং এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ দ্বারা পরিবৃত ; আর মেনশেভিক, সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবী দল প্রভৃতি পেটি-বুর্জোয়া দলগুলো সমাজতন্ত্র নির্মাণে কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা করার পরিবর্তে প্রতিবিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। এ কারণেই সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী একটি মাত্র দল নিয়েই সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

সোভিয়েত সংসদীয় ব্যবস্থা আর জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ পার্থক্য এ দুই ব্যবস্থায় সর্বহারার একনায়কত্বের রাজনৈতিক ক্ষমতার চরিত্রে কোন মৌলিক পার্থক্য সূচিত করে না, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতা থাকছে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে। ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি যে ভিন্নতর রূপ নিতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ব্যাপক সংখ্যক মেহনতী জনগণের জন্য গণতন্ত্রের সূচনা করেছে। এ গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল এটা কেবল মুখের কথাতে বা কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ নেই, মেহনতী জনগণের জীবনে এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে শ্রমজীবী জনগণ কেবল ভোটাধিকার, সমালোচনার অধিকার ইত্যাদি বিমূর্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী মাত্র নয়, এখানে শ্রমজীবী জনগণ স্বয়ং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজ পরিচালনা করে থাকেন।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে রাষ্ট্র শ্রমজীবী জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তি নির্মাণ করে। জনগণ উৎপাদনযন্ত্রের মালিক বলে শ্রমজীবী জনগণ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং খেটে খাওয়ার মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে। (মানুষের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি না করে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার দেয়ার মানে তাকে অনাহারে থাকার স্বাধীনতা দান করা— ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় যেমন হয়ে থাকে।) আবার শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব জনগণকে শিক্ষা, বিশ্রাম ও অবসর লাভের অধিকার দেয় এবং জনগণের হাতে পর্যাপ্ত শিক্ষালয়, ছুটি নিবাস, স্বাস্থ্য নিবাস, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তুলে দিয়ে ঐ অধিকারকে সার্থক করে তোলে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদ-পত্রের উপর জনগণের অধিকার বিস্তৃত হওয়ায় সর্বহারার একনায়কত্বে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি কথাগুলো পৃথিবীতে প্রথমবারের জন্য অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধনতান্ত্রিক দেশে পত্র-পত্রিকা বৃহৎ ধনিকরা পরিচালনা করে বলে মেহনতী মানুষের বক্তব্য সেখানে কোন দিনই স্থান পায় না। ধনতন্ত্রের সমর্থকরা অবশ্য বলে সমাজতন্ত্রে সংবাদ-পত্র রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে রাষ্ট্র সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর করায়ত্ত।

সোভিয়েত সংসদ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থায় ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব এবং ঐ সকল সংস্থার বিভিন্ন উপসংসদে ও নিজেদের জনসংগঠনের কাজে অংশ গ্রহণের মারফত শ্রমজীবী জনগণ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকে। বস্তুতঃ লেনিন যেমন বলেছেন, সর্বহারার একনায়কত্বের গণতন্ত্র ধনিক শ্রেণীয় গণতন্ত্রের চেয়ে লক্ষগুণ বেশী গণতান্ত্রিক।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ঃ

পুঁজিবাদ থেকে পূর্ণ সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটার পর উত্তরণকালীন সর্বহারার একনায়কত্ব থেকে জন্ম নেয় উচ্চতর পর্যায়ের জনগণের শাসন—সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের গণতন্ত্র সর্বহারার একনায়কত্বের আমলের সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র থেকে বিস্তৃত হয়ে সমগ্র জনগণের গণতন্ত্রে পরিণত হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রও বিকাশ লাভ করে। সর্বহারার একনায়কত্বের সামাজিক ভিত্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমেই ঐ রাষ্ট্র পরিণত হয় জনগণের রাষ্ট্রে। সোভিয়েত ইউনিয়নে মোটামুটি ১৯৩০-এর দশকের শেষার্ধে শোষক শ্রেণীর পূর্ণ বিলোপ সাধনের মাধ্যমে এ রূপান্তর ঘটেছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের মধ্যে কোন মৌলিক ব্যবধান নেই, কারণ এ দুই-ই মূলত একই ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থা—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এ দুই ব্যবস্থা একই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশে দুটো পর্যায় মাত্র। সর্বহারার একনায়কত্ব সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হলে তার সমাজতান্ত্রিক চরিত্র পরিবর্তিত হয় না, বিকশিত হয় মাত্র। সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রও সর্বহারার একনায়কত্বের মত একই লক্ষ্য অনুসরণ করে। তা হল, সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ।

সমাজতন্ত্র মানুষের জন্য কি গণতন্ত্র নিয়ে এসেছে আমরা এখন তা বিচার করে দেখব। আমরা সোভিয়েতের সমাজ নিয়েই আলোচনা করব। কারণ, সমাজতন্ত্র সেখানেই পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পূর্ণ তাৎপর্য এবং মর্যাদা উপলব্ধি করতে হলে তার উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করতে হবে। ধনতান্ত্রিক সমাজ. গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থকে কথার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে আবৃত করার প্রয়াসে, রাজনীতিকদের বাগাড়ম্বর এবং সংসদীয় বিতর্ক-বক্তৃতাকেই গণতন্ত্র বলে চালানোর চেষ্টা হয়, কিন্তু সমাজতন্ত্রে জনগণকে প্রকৃত অধিকার দান না করে শুধু কথা বলার অধিকার দেয়াকে গণতন্ত্র মনে করা হয় না। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অর্থ হল জনগণের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অর্পণ, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশ গ্রহণের অধিকার সুনিশ্চিত করা, জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক জীবন সংগঠিত করায় জনগণের অংশ গ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করা। সমাজতন্ত্রে এ সকল অধিকার ও স্বাধীনতা সকল নাগরিককে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সামাজিক উৎস নির্বিশেষে সকল নরনারীকে প্রদান করা হয়।

সমাজতন্ত্রে কি ধরণের গণতন্ত্র বিদ্যমান এবং তা কত সুদূরপ্রসারী সে বিবরণ দানের আগে আমরা আলোচনা করে দেখব কি কারণে সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র থাকা অত্যাবশ্যকীয়। লেনিন একদা বলেছিলেন, সকল সমাজতন্ত্রকে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কিন্তু এটা সদিচ্ছা মাত্র নয়। সমাজতন্ত্রের বিজয়ের, সমাজতন্ত্র কায়েমের পন্থা হল গণতন্ত্র। সমাজতন্ত্র নির্মাণের পক্ষে গণতন্ত্র একটি অপরিহার্য বাস্তব উপকরণ. নতুন সমাজ নির্মাণে ব্যাপক জনগণকে আগ্রহী করে তুলতে গণতন্ত্রের প্রয়োজন এবং ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণ ছাড়া সমাজতন্ত্র কায়েম হতে পারে না। লেনিন যেমন বলেছেন, ‘‘সমাজতন্ত্র উপর থেকে আইন করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সমাজতন্ত্রে

আমলাতান্ত্রিক কার্যক্রমের স্থান নেই ; সজীব সৃজনশীল সমাজতন্ত্র জনগণেরই সৃষ্টি।" বস্তুত, কেবলমাত্র সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে নতুন সমাজ, নতুন অর্থনীতি, নতুন সংস্কৃতি ও নতুন সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকালে যে সকল জটিল ও অজস্র সমস্যার সৃষ্টি হয় তার সমাধানে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই জনগণ নিজস্ব উদ্যোগে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজ আয়ত্ত করতে পারে।

বুর্জোয়া সমাজে যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাই প্রবল, সমাজতন্ত্রে তেমন নয়, সেখানে সমষ্টিগত চিন্তা ও কার্যধারাই বিরাজ করে ; কারণ, সমাজের মানুষদের কর্তব্য সম্পাদনের পন্থা সম্পর্কে সমাজতন্ত্র মোটেই উদাসীন নয়। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ মানুষকে শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, তার যথার্থ সদ্ব্যবহার যাতে হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে জনগণকে শিক্ষা লাভের অধিকার দান করেছে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ এ অধিকার জনগণ কিভাবে কাজে লাগাল সে বিষয়ে উদাসীন হয়ে থাকে না। সমাজতান্ত্রিক মানুষের সার্বিক উন্নতির কথা মনে রেখে সোভিয়েত রাষ্ট্র সকলের জন্য দশ বর্ষব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সার্বজনীন শিক্ষার নীতিকে কার্যকর করেছে। এ ছাড়া, সমাজ সর্বদাই মানুষের শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য সচেষ্ট রয়েছে। যেমন, কারখানায়, খামারে কর্মরত মেহনতী মানুষদের উচ্চশিক্ষা দানের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কাজ করাকে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করার সাথে সকলের পক্ষে কাজ পাওয়ার অধিকারকেও সুনিশ্চিত করা হয়েছে। আগেই বলেছি, সমাজতন্ত্রে কাজের পরিমাণ ও গুণ বিচার করে মজুরি

দেওয়া হয় এবং তার ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে সমাজের প্রয়োজন সব মানুষের কাছ থেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ আদায় করা সম্ভব হয়। সমাজতন্ত্রে কাম চোরদের বরদাস্ত করা হয় না এবং সামাজিক কর্তব্যে কাউকে ফাঁকি দিতে দেয়া হয় না। সমাজতান্ত্রিক সমাজের নীতিই হল : 'যে কাজ করবে না সে খাবেও না'।

রাষ্ট্র পরিচালনায় সমাজের মানুষ কতখানি অংশ নেয় সে বিষয়েও সমাজতান্ত্রিক সমাজ উদাসীন নয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার শুধুমাত্র একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, অর্থাৎ এ অধিকার বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষমতা সকলের আছে কিনা তা সেখানে বিবেচিত হয় না ; বুর্জোয়া গণতন্ত্রে মানুষের ওপর কতকগুলো নেতিবাচক দাবী রাখা হয়, যথা রাষ্ট্রের স্বার্থহানি ঘটাবে না, অন্য ব্যক্তির স্বার্থ, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতির অন্তরায় হবে না ইত্যাদি। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র দাবী করে যে, সমাজের সব সদস্য সামাজিকভাবে সক্রিয় হবে, সমাজের স্বার্থে, রাষ্ট্রের কাজে উদ্যোগ সহকারে অংশ গ্রহণ করবে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা কারো মর্জির উপর নির্ভর করে না, এ গণতন্ত্রে জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত ; সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই এ অধিকারের মূল নিহিত আছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধনিক শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত বলে ধনিক শ্রেণী তার স্বার্থের প্রয়োজনে যখন খুশী গণতন্ত্রের খোলস ফেলে দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর নগ্ন একনায়কত্ব কায়েম করে। ১৯২০ এবং '৩০ এর দশকে ইটালী, জার্মানী, স্পেনে এমন ঘটেছিল। সম্প্রতি গ্রীসে গণতন্ত্র দূর করে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এভাবে, ধনিক শ্রেণীর বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে। প্রয়োজন হলে অর্থাৎ গণদাবী মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেলে

ইউরোপের সব দেশে এহেন সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আছে সে খবরও ফাঁস হয়ে গেছে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার যে সব দেশে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র আছে সে সব দেশেও জনসাধারণের অধিকারের কোন নিশ্চয়তা যে নেই, জনগণের অধিকারের উপর ধনিক রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপেই তার প্রমাণ। একথা কে না জানে. বৃটেনের জনগণ শ্রমিক বা রক্ষণশীল দল যাদেরই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসাক না কেন, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাষ্ট্র চলে তার নিজেরই নিয়মে এবং সে নিয়ম হল গণবিরোধী নীতি। এ কথাও সুবিদিত যে মার্কিন জনগণ যাদেরই ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট বা কংগ্রেস সদস্য বানান না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হয় পেন্টাগণ আর সি, আই-এর নির্দেশে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে।

অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক দেশে যারাই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হয়ে আসুন না কেন, তাঁরা কেবল জনগণের স্বার্থেই কাজ করে থাকেন। সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণের বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদের অবিরাম বিকাশই তার প্রমাণ। এর কারণ বোঝা খুব কঠিন নয়। সাম্প্রতিক এক হিসাব অনুযায়ী. মার্কিন কংগ্রেসের (সর্বোচ্চ আইন পরিষদ) সদস্যদের মধ্যে ১৪৬ জন ছিলেন ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি বা মিল-কারখানা মালিক. ২২ জন ছিলেন বৃহৎ ভূস্বামী এবং ৩১৪ জন ছিলেন পুঁজিপতিদের বেতনভুক উকিল ; একজন শ্রমিক বা কৃষক সেখানে ছিল না। এ কংগ্রেস সদস্যরা কার স্বার্থ দেখবে তা বলাই বাহুল্য।

অপরপক্ষে, সুপ্রীম সোভিয়েতে ১৫১৭ জন ডেপুটির মধ্যে (১৯৬৬) : ৬৯৮ জন শ্রমিক কৃষক (৬০ শতাংশ). বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনীয়ার. শিক্ষক, ডাক্তার, পার্টি কর্মী, শিল্পী ইত্যাদি ৮১৯ জন। এদের মধ্যে মহিলা ৪২৫ জন—ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সকল পার্লামেন্টের মিলিত মহিলা সদস্যদের চেয়ে

বেশী। আরেকটি দৃষ্টান্ত নিলে, সমাজতান্ত্রিক জার্মানীতে জন-পরিষদে (পিপল্‌স চেম্বার) ৬৬ শতাংশ ছিলেন শ্রমিক-কৃষক, অবশিষ্টরা অফিস কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি। কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনিক শ্রেণীর লোক নির্বাচিত হয় না, কারণ ধনিক শ্রেণী সে সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশে যে বিশেষ ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হন না কেন তাঁরা জনস্বার্থই দেখেন। আর ধনিক সমাজে গণতন্ত্রের এমনই মহিমা যে, সব সময়েই ধনিক শ্রেণীর লোকেই নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন—বলাবাহুল্য ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র আর সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে এখানেই পার্থক্য।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার ভিত্তিতে জনগণ যে অধিকার লাভ করেছে তা কোন বিমূর্ত বা কাগুজে অধিকার মাত্র নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ অধিকার বাস্তবে প্রদত্ত হয়েছে। যেমন, সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র, পার্টি ও জনসংগঠনসমূহের হাতে প্রকাশনালয়, মুদ্রণালয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ কাগজ প্রদত্ত হয়েছে; এগুলো মত প্রকাশের স্বাধীনতার বাস্তব নিশ্চয়তা বিধান করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে যে তিনটি প্রকাশনালয় বৃহত্তম, যথা, প্রাভদা, প্রফিজদাত এবং মোলোদায়া গোয়াদিয়া, তাদের মধ্যে একটির মালিক কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, আর একটির মালিক সারা ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ এবং তৃতীয়টির পরিচালক যুব কমিউনিষ্ট লীগ। আবার মেহনতী জনগণও তাদের সংগঠনের হাতে সভা অনুষ্ঠানের ভবন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অর্পিত হয়েছে; এর ফলে বাক্‌-স্বাধীনতার বাস্তব নিশ্চয়তা বিধান হয়েছে; ধনতান্ত্রিক প্রথার সমর্থকরা অবশ্য এর পরেও বলে থাকে যে, সোভিয়েতে কমিউনিষ্ট পার্টির একচেটিয়া শাসন প্রবর্তিত হয়েছে কিন্তু তাদের মনে রাখা দরকার যে সোভিয়েতে কমিউনিষ্ট পার্টটাই জনগণের

পার্টি—এ পার্টির ৪৮ শতাংশ শ্রমিক, অবশিষ্টদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশী ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরি ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিক ও জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অবৈতনিক শিক্ষা, প্রভূত পরিমাণ বৃত্তি প্রদান ইত্যাদির ফলে সোভিয়েত এবং অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও জনগণের শিক্ষার অধিকার বাস্তব রূপলাভ করেছে। তুলনা করলে দেখব, ধনিক সমাজে সাধারণ মানুষের আছে কেবল অশিক্ষিত থাকার 'গণতান্ত্রিক অধিকার'। ধনতান্ত্রিক জগতে যেক্ষেত্রে অনুন্নত দেশে ৮০/৮৫ শতাংশ লোক নিরক্ষর এবং উন্নত দেশে অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত অধিকাংশ লোক শুধুই অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, সেক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশে অধিকাংশ লোকই বলা চলে রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত। সোভিয়েতে (মোট লোকসংখ্যা ২৫ কোটি) প্রায় পৌণে আট কোটি লোক বিভিন্নভাবে শিক্ষা লাভে নিয়োজিত আছেন।

বৃদ্ধ বয়সে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের বৈষয়িক নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে সামাজতান্ত্রিক দেশসমূহে। বার্ধক্যকালীন ভাতা, ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা বীমা, বিনা মূল্যে চিকিৎসা, ব্যাপক সংখ্যক স্বাস্থ্য নিবাস ইত্যাদির মাধ্যমে এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। জনস্বাস্থ্য খাতে সোভিয়েত রাষ্ট্র ৮৩০ কোটি রুবল ব্যয় করে; সোভিয়েতে ৪৫ লক্ষ মেডিকেল কর্মী আছেন, তার মধ্যে ৬ লক্ষ ডাক্তার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন এতগুলি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশে মোট যত ডাক্তার আছে তার চেয়ে বেশী ডাক্তার আছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় মুষ্টিমেয় ধনিক ছাড়া সব মানুষকে বেকারি, অনাহার আর অচিকিৎসার আশঙ্কা এমনভাবে

কাতর করে রাখে যে, গণতান্ত্রিক অধিকারের কথাটা অধিকাংশ মানুষের কাছে ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। অপর পক্ষে, সমাজতন্ত্র সমাজের সব মানুষের বিকাশের জন্য বাস্তব ও প্রকৃত সমান সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এটাই মূল তাৎপর্য।

সমাজতন্ত্রের শত্রুরা সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র নেই বলে যতই প্রচার করুক না কেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা আলোচনা করলে দেখা যাবে, এত গণতন্ত্র পৃথিবীতে কেউ কখনও ভোগ করেনি। সোভিয়েতের ব্যবস্থা নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র :

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সোভিয়েত সংস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। রুশ ভাষায় সোভিয়েত মানে হল পরিষদ। সোভিয়েত ইউনিয়নে সুবিস্তৃত ভূ-ভাগ জুড়ে শতাধিক জাতির ব্যাপকসংখ্যক জনগণ বাস করে। সকল অঞ্চলের ও সকল জাতির ও উপজাতির মানুষের সমান সুযোগ অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ফেডারেল রাষ্ট্রের রূপ দান করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানে ১৫টি সার্বভৌম ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সমবায়ে গঠিত। এ সকল ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে আবার আছে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং জাতীয় অঞ্চল। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের বা জাতির জনগণকে ন্যায্য অধিকার দানের জন্যই এ রকম রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছে। সকল জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্মত অধিকার প্রদানের ফলেই বহু জাতি অধ্যুষিত সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন জাতিতে জাতিতে সদ্ভাবপূর্ণ সুসমঞ্জস রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হয়েছে। এটা

সমাজতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে কত বড় কৃতিত্বের বিষয় তা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যদি আমরা মনে রাখি যে মাত্র পাঁচটা জাতি অধ্যুষিত পাকিস্তানকে এর বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী টিকিয়ে রাখতে পারল না, শুধুমাত্র সুষ্ঠু জাতীয় নীতির অভাবে, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অস্বীকারের ফলে। অবশ্য একথাও ঠিক যে কোন ধনতান্ত্রিক দেশেই জাতি সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না— সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হোক, কানাডাই হোক অথবা ইংল্যাণ্ডই হোক ; কারণ জাতিগত শোষণ ধনতান্ত্রিক শোষণের একটা প্রধান অঙ্গ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরোক্ত কাঠামোর সাথে সঙ্গতি রেখে সোভিয়েত-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত হল : সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ 'সুপ্রীম সোভিয়েত', তারপর ১৫টি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত, ২০টি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত এবং ৮৮৭৭০টি স্থানীয় সোভিয়েত (বিভিন্ন অঞ্চল জেলা, শহর, গ্রাম ইত্যাদির জন্য গ্রাম সোভিয়েত, জেলা সোভিয়েত ইত্যাদি)।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্বাচন ব্যবস্থা যতদূর হতে পারে গণতান্ত্রিক। ১৮ বছরের উর্ধ্বে যে কোন ব্যক্তির (একমাত্র আইনের মধ্যে, ঘোষিত উন্মাদ ব্যক্তিরা ছাড়া) ভোট দানের অধিকার আছে। যে কোন নাগরিকের যে কোন সোভিয়েত সংস্থায় নির্বাচিত হওয়ার অধিকার আছে, তবে তার নিম্নতম বয়:সীমা হল, স্থানীয় সোভিয়েতের ক্ষেত্রে ১৮, ইউনিয়ন বা স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েতের ক্ষেত্রে ২১ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ২৩। সব নাগরিকের ভোটাধিকার সমান অর্থাৎ একজন লোকে একটা ভোট দিতে পারে। সব সোভিয়েতের নির্বাচনই প্রত্যক্ষ—গ্রাম সোভিয়েত থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে।

সোভিয়েতে জনগণের ভোটাধিকার পালনের সব রকম সুযোগ দেয়া হয়। ছুটির দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় প্রয়োজনীয়সংখ্যক নির্বাচন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। গ্রামাঞ্চলে ১০০-৫০০ জন লোকের জন্য ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়—সুদূর উত্তর বা পূর্বাঞ্চলে অথবা পার্বত্য অঞ্চলে পঞ্চাশ জন লোকের জন্যও ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। হাসপাতালে, মেটারনিটি হোমে, স্বাস্থ্য নিবাসে, বিমান বন্দরে, রেল ষ্টেশনে, দূরগামী রেল গাড়ীতে, এমন কি ২০ জন ভোটার যাত্রী আছে এমন জাহাজে পর্যন্ত ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। অসুস্থদের জন্য তাদের বিছানার কাছে ভোটের বাক্স নিয়ে আসা হয়।

সোভিয়েত প্রার্থী মনোনয়নের পদ্ধতি এত বেশী গণতান্ত্রিক যে ধনতন্ত্রের প্রবক্তারা তার বিরুদ্ধে অনবরত বিষোদ্গার না করে পারে না। সোভিয়েতে বস্তুত মনোনয়নের মাধ্যমেই প্রাথমিকভাবে নির্বাচন ঘটে যায়। কারণ নির্বাচকমণ্ডলীই মনোনয়ন দান করে থাকেন।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রার্থী মনোনয়নের অধিকার আছে ট্রেড ইউনিয়ন, কমিউনিষ্ট পার্টি যুবসমিতি, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সমবায় সমিতি ইত্যাদি জনসংগঠনের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের সাধারণ সমাবেশের।

কার্যক্ষেত্রে অবশ্য বিভিন্ন গণ-সংগঠনের সাধারণ সভায় প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়। এর ফলে জনসমর্থনহীন কোন ব্যক্তির পক্ষে নির্বাচনে দাঁড়ানোরই সুযোগ হয় না। ধনতান্ত্রিক দেশে দু'জন সমর্থন করলেই নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার যে অধিকার আছে তার ফলে নিতান্ত গণধিক্কৃত ব্যক্তিও নির্বাচন প্রার্থী হয়ে নানা কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারে। এর তুলনায় সোভিয়েতের নির্বাচনী মনোনয়ন প্রথা যে অনেক বেশী গণতান্ত্রিক তা বলাই বাহুল্য।

এভাবে মনোনীত হওয়ার পর প্রার্থীকে কোন খরচ করতে হয় না। নির্বাচনী প্রচার ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমস্ত খরচ রাষ্ট্রই বহন করে। কারণ এটা জনগণের রাষ্ট্র এবং জনগণের স্বার্থে উপযুক্ততম ব্যক্তিকে নির্বাচন করাই এ রাষ্ট্রের নির্বাচনের লক্ষ্য।

সোভিয়েতের নির্বাচন পদ্ধতির বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের প্রবক্তারা বলে থাকে যে, এ ব্যবস্থায় প্রতি নির্বাচনী এলাকাতে একজন মাত্র প্রার্থীকে মনোনীত করার ফলে গণতন্ত্র ব্যাহত হয়। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সোভিয়েত আইনে এক নির্বাচনী এলাকা থেকে একাধিক প্রার্থী মনোনয়নে কোন বাধা নেই। কিন্তু বাস্তবে এক এলাকা থেকে একজনই মনোনীত হয়ে থাকেন এবং এটাই রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। সোভিয়েতে শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই বলে পার্টি এবং পার্টি বহির্ভূত জনগণ একই জনকল্যাণমূলক চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীই প্রাথমিক মনোনয়ন দান করেন বলে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান সেখানে অনাবশ্যক। আবার একজনকে মনোনয়নের ফলে জনসমর্থনহীন কেউ যাতে নির্বাচিত না হতে পারে তার ব্যবস্থাও সোভিয়েতে আছে।

নির্বাচনে যদি মোট ভোটদাতার ৫০ শতাংশের বেশী লোক ভোট না দেয় তাহলে সে নির্বাচন বাতিল গণ্য করা হয়। আবার মোট প্রদত্ত ভোটের অধিকাংশ অর্থাৎ ৫০ শতাংশের বেশী ভোট না পেলে কাউকে নির্বাচিত গণ্য করা হয় না। যদি কোন নির্বাচনে ৫০ শতাংশের কম ভোটার ভোট দান করে অথবা প্রার্থী যদি মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের কম ভোট পান তাহলে ঐ নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করে ১৫ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হয়।

এ নির্বাচন প্রথা যে খুবই গণতান্ত্রিক সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ

নেই। এ ব্যবস্থা যে সোভিয়েতে খুবই জনপ্রিয় তাতেও সন্দেহের অবকাশ কম। দু'একটা হিসাব দিলেই কথাটা বোঝা যাবে: সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্বাচনে ১৯৪৬ সালে ৯২·২ শতাংশ, ১৯৫০ সালে ৯৯·৭ শতাংশ, ১৯৫৪ সালে ৯৯·৮ শতাংশ, ১৯৫৮ সালে ৯৯·৭ শতাংশ, ১৯৬২ সালে ৯৯·৯৫ শতাংশ, ১৯৬৬ সালে ৯৯·৯৪ শতাংশ ভোটার অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সোভিয়েতের জনগণ নিজেদের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আস্থাশীল এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন না হত তা হলে নিশ্চয়ই এত ব্যাপক সংখ্যায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করত না। শুধু তাই নয়, নির্বাচন পরিচালনায়ও জনগণ উৎসাহের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। ১৯৬৭ সালে স্থানীয় সোভিয়েতসমূহের নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে সাড়ে বাইশ লক্ষের বেশী নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছিল এবং এদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ।

গণতন্ত্রের এখানেই শেষ নয়। নির্বাচিত হওয়ার পর কোন জনপ্রতিনিধি যদি কর্তব্য পালন না করেন, তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার আছে নির্বাচকমণ্ডলীর এবং এ অধিকার কেবল কাগুজে অধিকার নয়। যেমন, ১৯৬৫ সালে সাড়ে তিনশ জনেরও বেশী স্থানীয় সোভিয়েতে ডেপুটিকে (প্রতিনিধি) নির্বাচকমণ্ডলী ফিরিয়ে নেন। একাধিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত সদস্যকেও কর্তব্য পালন না করায় প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েত গঠনের মধ্যেও সোভিয়েত গণতন্ত্রের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। সোভিয়েতের দু'টি কক্ষ—ইউনিয়ন সোভিয়েত এবং জাতিসমূহের সোভিয়েত। প্রথম কক্ষের জন্য প্রতিনিধি

নির্বাচিত হন প্রতি তিন লক্ষ নাগরিকের জন্য একজন হিসাবে. আর দ্বিতীয় কক্ষের জন্য বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র বা স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি থেকে জনসংখ্যা নির্বিশেষে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন নিম্নোক্ত হারে: প্রতি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র থেকে ৩২ জন, স্বায়ত্ত-শাসিত প্রজাতন্ত্র থেকে ১১ জন, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল থেকে ৫ জন, জাতীয় এলাকা থেকে ১ জন। উপরোক্ত দুটো কক্ষের অধিকার সমান এবং দু'কক্ষ একমত না হলে কোন আইন পাস হয় না। এর ফলে ক্ষুদ্রতম জাতিসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণেরও চমৎকার সুব্যবস্থা হয়েছে এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের এ গঠনের মধ্যে বহু জাতি সমন্বিত জনগণের অপূর্ব প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি:

ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সময় অর্থনীতি এবং সামাজিক সম্পর্কের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিও গড়ে তুলতে হয় সমাজতন্ত্রকে সফল করার জন্য।

সম্প্রতি মাওবাদী চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে এমন সব অনাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অনেক স্থানে, বিশেষতঃ অনগ্রসর দেশসমূহে মাওপন্থীরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে এমন সব আজগুবী প্রচার করে থাকে যে, এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন। তা না হলে এ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থেকে যাবে।

মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলতে বোঝায় প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির স্থানে নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে

তোলা। কিন্তু নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে গিয়ে ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে সর্বাংশে বর্জন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। সমাজতন্ত্র ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদানসমূহকে গ্রহণ করে. তার যথোপযুক্ত পুনর্মূল্যায়ন করে এবং তাকে সমগ্র জনগণের আয়ত্তে এনে দেয়। বস্তুত, অতীতের সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে হবে। লেনিন যেমন বলেছেন, "ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক সমাজের জোয়ালের নীচে থেকে মানব-সমাজে যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত করেছে তার স্বাভাবিক বিকাশসাধনই হবে সর্বহারার সংস্কৃতির কর্তব্য।"

অতীতের সংস্কৃতিকে নতুনভাবে বিচার করে গ্রহণ করা বলতে কি বোঝায় তাও পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। কারণ, আমরা দেখেছি, মাওবাদী চীনে সাংস্কৃতির বিপ্লবের নামে সেক্সপীয়ারের গ্রন্থকে বুর্জোয়া বলে ধ্বংস করা হয়েছে সাম্প্রতিককালে এবং আমাদের এই উপমহাদেশে উগ্র বামপন্থীরা সুকান্ত প্রমুখ বামপন্থী কবিসাহিত্যিক ছাড়া আর সব সাহিত্যিকের অবদানকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। আসলে অতীতে সংস্কৃতিকে বাছাই করে গ্রহণ করার অর্থ হল অতীতের সকল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কার ও অবদানকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত ও ব্যবহার করা এবং ঐ সকল শিল্প ও সাহিত্যকীর্তিকে গ্রহণ করা যার মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও মানব চেতনার প্রতিফলন ঘটে এবং উৎকৃষ্ট শিল্পগুণের প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি কেবল অতীত সংস্কৃতিকে অন্ধভাবে গ্রহণ করে না, পরন্তু অতীতসংস্কৃতির যে অংশ সমাজ-তন্ত্রের বিকাশে সহায়ক হয় তাকে গ্রহণ করে এবং যে অংশ প্রতিক্রিয়াশীল তাকে বর্জন করে। যেমন, সোভিয়েত জনগণ টলষ্টয় বা ডস্টয়ভস্কির সাহিত্য-প্রতিভাকে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়েছে এবং তাঁদের কাছ থেকে

শিক্ষা গ্রহণ করছে কিন্তু তাঁদের যুক্তিহীনতা বা অতীন্দ্রিয়বাদকে গ্রহণ করেনি ; তেমনি আমরাও সমাজতন্ত্র কায়েম হলেও বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল ইসলামকে বাতিল করে দেব না, তাঁদের রচনার যে অংশে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের গভীর বাস্তবতাবোধ এবং মানবতাবোধ গণতান্ত্রিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তা আমরা গ্রহণ করব ; কিন্তু যে অংশ অবৈজ্ঞানিক বা প্রগতিবিরোধী বা ভাববাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে তা দ্বারা প্রভাবিত হব না।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য অতীত সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন ও আত্মীকরণ, নতুন সমাজের স্বার্থে পুরনো সমাজের বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো এবং জাতীয় স্বার্থে বুদ্ধিজীবীদের নতুনভাবে শিক্ষিত করে তোলা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু এটুকুই সব নয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পাদনের জন্য আপামর জনগণকে শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত করে তোলা, জনগণের মধ্য থেকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে তোলা, মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনা জাগ্রত করে তোলা, মানুষকে সমাজতন্ত্রের নির্মাতা রূপে গড়ে তোলা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই হল মূল কথা।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল কাজ হল প্রকৃত জনগণের সংস্কৃতি গড়ে তোলা। শোষণযুক্ত সমাজে অল্প কিছুসংখ্যক সুবিধাভোগী লোক সভ্যতার সকল সুফল ভোগ করে থাকে এবং ব্যাপকসংখ্যক জনগণ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের সকল অবদান থেকে বঞ্চিত থাকে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জনগণ ও সংস্কৃতির মধ্যে এই যে বিরাট ফারাক এটাকে দূর করেই সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমাধা করতে হবে। অর্থাৎ মানব সমাজের আয়ত্তাধীন সকল আত্মিক সম্পদ, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সকল অবদান জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে এবং জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান দ্রুত উন্নত করে জনসাধারণের

সৃজনশীল ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে হবে। তা হলেই শুধু সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে আসন গ্রহণ করতে পারবে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উন্নত এবং অনুন্নত সকল দেশেই এ বিপ্লব সম্পন্ন করার আবশ্যকতা রয়েছে। সবচেয়ে উন্নত গণতান্ত্রিক দেশেও জনগণের ব্যাপক অংশ তথা শ্রমজীবী জনগণ সংস্কৃতির স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে বৈষয়িক উৎপাদনের মত সংস্কৃতির সকল উৎপাদনের উপরও শাসকশ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার বিস্তৃত থাকে বলে তারা শ্রমজীবী জনগণের সংস্কৃতির মান নিম্নতম পর্যায়ে রেখে দেয়; শুধু পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য যেটুকু শিক্ষা সংস্কৃতি অত্যাবশ্যক, সেটুকুই তাদের দেয়া হয়। অনুন্নত দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতঃই আরো বেশী।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক লাফে সমাধা করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘকালব্যাপী ধৈর্যশীল প্রচেষ্টা ও সংগঠিত কার্যকলাপ। জনগণের জ্ঞান-পিপাসা ও সংস্কৃতির তাগিদকে ঠিক পথে চালিত করতে হলে ও পরিপূর্ণভাবে মিটাতে হলে তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের আবশ্যকতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে: তার জন্য ব্যাপক বৈষয়িক ভিত্তি নির্মাণ প্রয়োজন। এ ভিত্তি নির্মিত হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংস্কার, যথা, জাতীয়করণ, শিল্পায়ন, কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে। শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করার সকল উপকরণ যথা, থিয়েটার, সিনেমা, যাদুঘর, পাঠাগার, বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র, সংবাদপত্র ইত্যাদি জাতীয়করণ করে জনগণের হাতে সমর্পণ করে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সকল জনগণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করে এবং তাদের শিক্ষার মান উন্নত করে সংস্কৃতির সকল অবদান তাদের হাতে তুলে দেয়।

মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্রের শত্রুরা একদা বলত যে, শ্রমিক শ্রেণী যথেষ্ট উচ্চ সাংস্কৃতিক মান অর্জন না করা পর্যন্ত তার পক্ষে ক্ষমতা দখল করা অনুচিত। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, 'অপরিণত' 'অশিক্ষিত' 'অনুন্নত' জনসাধারণ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না। লেনিন এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, ''সুযোগ উপস্থিত হলে শ্রমিক শ্রেণীকে ক্ষমতা দখল করতে হবে এবং তার পর অতি দ্রুত জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করতে হবে।'' লেনিনের এই বক্তব্যের সত্যতা বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী অন্যান্য মেহনতী জনগণের সাথে একজোট হয়ে ক্ষমতা দখল করে। সে সময় রাশিয়া ছিল অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ। ক্ষমতা দখলের পরে শ্রমিক শ্রেণী জাতীয় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে। কুড়ি বছরের মধ্যেই নিরক্ষতার বিলোপ সাধন করা হয়। ১৯৩৭ সালের মধ্যেই সারা দেশে হাজার হাজার বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, পাঠাগার, যাদুঘর ও সংস্কৃতিকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়।

শুধু রাশিয়াতেই নয়, সাংস্কৃতিক বিপ্লব অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। যেমন: বিপ্লবের আগে পোল্যাণ্ডে নিরক্ষরতার হার ছিল ২৩ শতাংশ, রুমানিয়ায় ৪৩ শতাংশ, বুলগেরিয়াতে ২৭ শতাংশ ইত্যাদি। বর্তমানে এ সকল দেশে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে আর এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে মাত্র অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই। সমাজতান্ত্রিক দেশে শিক্ষার প্রসার কত ব্যাপক একটা তুলনামূলক বিচার থেকে তা বোঝা যাবে। ১৯৬৭-৬৮ সালে জনসংখ্যার ১০০০০ জন লোক প্রতি ছাত্র সংখ্যা যুগোশ্লাভিয়াতে ছিল ১০৫ জন, বুলগেরিয়ায় ১০১

জন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় ৯৬ জন, মঙ্গোলিয়ায় ৮১ জন আর সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনে ৬৩ জন, ইটালীতে ৫৭ জন ও পশ্চিম জার্মানীতে ৪৯ জন। অর্থাৎ কয়েক শ' বছর সারা পৃথিবীতে দোর্দণ্ড প্রতাপের রাজত্ব করেও ধনতন্ত্র গণশিক্ষা বিস্তারে ক্ষেত্রে যা করতে পারেনি সমাজতন্ত্র বিশ বছরের কম সময়ে তা করতে সক্ষম হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি অবশ্যই বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য শিক্ষা, নৈতিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ; কিন্তু সমাজতন্ত্রে এ সব ক'টি উপাদান বন্ধনমুক্ত, সমাজতান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলে কথাটা পরিষ্কার হবে।

সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞান ঃ

বর্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিপ্লবের যুগ। আণবিক শক্তি, রেডিও ইলেকট্রনিক্স্, মহাকাশ বিজয়, রসায়ন শাস্ত্র ও প্রাণ-বিদ্যায় অগ্রগতি সর্বোপরি সাইবারনেটিক্স্-এর অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে বিজ্ঞানের জগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বিজ্ঞান বর্তমানে ক্রমেই একটি প্রত্যক্ষ উৎপাদিকা শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারসমূহের ভিত্তিতে শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। শিল্পের ভবিষ্যৎ এবং বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমান বিশ্বে ধনবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয় প্রকার সমাজ ব্যবস্থাতেই পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে তার আভ্যন্তরীণ অসংগতির কারণে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। বিজ্ঞানের বিকাশ স্বভাবতই উৎপাদনের বিকাশ ঘটাতে চায়। কিন্তু পুঁজিবাদী শোষণের ফলে লোকের ক্রয়ক্ষমতা সঙ্কুচিত থাকে

বলে উৎপাদনের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয় না। মুনাফাই পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্য বলে ধনতান্ত্রিক সমাজে অবিরাম উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারের গতিরোধ করার চেষ্টা হয়।

অপরপক্ষে সমাজতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিপ্লব অভাবিত সমাদর লাভ করে। জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য বলে এই সমাজ ব্যবস্থায় অবিরাম উৎপাদন বৃদ্ধির পথে কোন প্রতিবন্ধক নেই। সমাজতন্ত্র তাই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিপ্লবের ফলসমূহকে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারে অর্থনৈতিক বিকাশের কাজে। বস্তুত: আধুনিক বিজ্ঞানের উপযুক্ত সমাজ কাঠামো হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এই যুগে পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামো বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিকাশকে কেবল ব্যাহতই করতে পারে. ঠিক যেমন একদা মধ্যযুগীয় সমাজ কাঠামো তৎকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই যুগে তাই বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণ মুক্তি দিতে পারে সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন দলগত ও ব্যবসায়িক স্বার্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে গোপনীয়তার জন্ম দেয়, এর ফলে স্বভাবতই বিজ্ঞানের বিকাশ ব্যাহত হয়। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সামগ্রিক জাতীয় পরিকল্পনায় ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালিত হয় বলে সেখানে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদের কার্যকলাপের সমন্বয়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় এবং সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ কথা সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিজ্ঞানীরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেন বলে তাঁরা ভাববাদী চিন্তাধারার প্রভাব মুক্ত হয়ে সাফল্যের সঙ্গে গবেষণার কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। পুঁজিবাদী সমাজে অল্পসংখ্যক যে সব বিজ্ঞানী মার্কসবাদ গ্রহণ করেছেন তাঁরা ছাড়া আর সকলেই এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

সমাজতন্ত্র যে বিজ্ঞানের প্রকৃতই মুক্তি নিয়ে আসে সোভিয়েত বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা:

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নৈতিকতাবোধেরও নির্দিষ্ট শ্রেণী চরিত্র থাকে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণী তার ভাবাদর্শ ও নৈতিকতা অবশিষ্ট সমাজের উপর আরোপ করে। শ্রেণী সংগ্রামের অগ্রগতির সাথে সাথে অবশ্য শোষিত শ্রেণীর ভাবাদর্শও ক্রমশ বিস্তার লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত জয়-লাভও করে। তথাপি, যতদিন শ্রেণী সমাজ বজায় থাকে ততদিন শোষক শ্রেণীর ভাবাদর্শই সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে।

যেমন, ধনতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যমান নৈতিকতা ধনিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। ধনিক সমাজে বিত্তবানকেই সর্বাধিক সম্মান দেয়া হয়; যার টাকা আছে তার সাত খুন মাফ। স্পষ্টতঃই এটা ধনিকদের উপকারার্থে ধনিকদের সৃষ্ট নীতি; কারণ যে সমাজে অধিকাংশ লোকই নির্বিত্ত, সে সমাজে ধনবাদের মহিমা কীর্তন নিশ্চয়ই জনগণের স্বার্থে হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে মানুষের এক অলঙ্ঘনীয় অধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হয় যদিও এ সমাজে অধিকাংশ মানুষেরই কোমরের ঘুনসি ছাড়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে আর কিছুই নেই। স্পষ্টতঃই উৎপাদনযন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এ ধারণা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। আবার ধনিক সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক গালভরা বুলি শোনা যায়, যার মূল কথা হল ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার জয়গান। এতেও সেই ধনিকদের স্বার্থই জড়িত। অন্যকে ঠকিয়ে শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ করে, অন্য পুঁজিপতিকে ফাঁকি দিয়ে ধন সঞ্চয় করা ধনিকদেরই ধর্ম। শ্রমজীবী জনগণ পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে, তার নীতি হওয়া উচিত

পরস্পরের সাথে মিত্রতা ও সহযোগিতা। কারণ তারা সকলেই সমপরিশ্রমী, প্রবঞ্চনা তাদের নীতি হওয়ার কোন কারণ নেই। অথচ ধনিক সমাজে আত্মকেন্দ্রিকতাকেই আপামর জনগণের নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার বিরাম-হীন প্রচেষ্টা চলে। বস্তুত, ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত নীতির লক্ষ্যই হল ধনিক সমাজকে জোরদার করা, পুঁজিবাদকে সুরক্ষিত করা।

এর সাথে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাব সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী নৈতিকতা হচ্ছে সবচেয়ে প্রগতিশীল ও মানব কল্যাণমূলক নৈতিকতা। সমাজতান্ত্রিক ও নৈতিকতা কেবল মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত নয়, সমাজের ব্যাপক অধিকাংশ জনগণ, সমগ্র মেহনতী জনগণের কল্যাণ সাধনই এর লক্ষ্য।

শাসকশ্রেণীর শোষণ অত্যাচার আর নীতিহীনতার বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে সংগ্রামী মানুষ যে সব মহৎ নীতিবোধ অর্জন করেছে তা গ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা পুষ্ট হয়েছে। সততা, সাহস, দৃঢ়তা, কর্তব্য পালন ইত্যাদি হল চিরকালের মেহনতী মানুষের গুণ। শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে, যৌথ শ্রমের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী জনগণ পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য, নিরলস পরিশ্রম ইত্যাদি মহৎ গুণ অর্জন করেছে। এ সকল গুণই যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় চিরন্তন নৈতিক গুণ হিসেবে চলে এসেছে। এ যুগের সবচেয়ে প্রগতিশীল, সবচেয়ে উন্নত শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর নৈতিকতাই এই সমাজতান্ত্রিক সমাজের নৈতিকতা সৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার প্রথম প্রকাশ ঘটে ধনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর, শ্রমজীবী জনগণের প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে তার পূর্ণ বিকাশ ও রূপায়ন শুধু সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিজয়ের পরেই এক সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব হয়।

সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার মূল সূত্র হল : সমাজের কল্যাণের জন্য শ্রম সাধন ; সমাজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রয়াস, উচ্চ নাগরিক কর্তব্য-বোধ, জনবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ, সমষ্টিগত মনোভাব এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ; ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মানবিক সম্পর্ক স্থাপন, সততা, সত্যবাদিতা, বিনয়, ভদ্র, শূন্যতা, নৈতিক বিশুদ্ধতা ইত্যাদি গুণ অর্জন, পারিবারিক জীবনে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার, শিশুর সুষ্ঠু লালন পালন, অন্যায়, অসাধুতা ; অর্থগৃধ্নুতা, পরগাছা বৃত্তির প্রতি কঠোর মনোভাব, সকল জাতির প্রতি বন্ধুসুলভ মনোভাব এবং জাতিবিদ্বেষ ও ধর্মবিদ্বেষের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ ; কমিউনিষ্ট আদর্শের প্রতি আনুগত্য, সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি ও সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা ; সকল দেশের সকল জাতির শ্রমজীবী জনগণের প্রতি মিত্রসুলভ মনোভাব ইত্যাদি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, উপরোক্ত সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা সমাজতান্ত্রিক সমাজের অধিকাংশ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করেছে। অবশ্য অতীতের স্মৃতি সহজে বিলুপ্ত হবার নয় এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ক্ষতিকর নীতিবোধ হয়তো আরও অনেক কাল আংশিকভাবে টিকে থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও ক্ষতিকর প্রভাব ছড়াতে থাকবে। সে জন্যই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও কমিউনিষ্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী নৈতিকতার বিকাশের দিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন দিকের একটা অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা উপরে দিয়েছি। এটা কোন আদর্শ সমাজতান্ত্রিক সমাজের কল্পিত চিত্র নয় ; আমাদের এ পৃথিবীতে এক বিস্তৃত অংশে এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং আমরাও পারি আমাদের দেশে সুখী সমাজতান্ত্রিক সমাজ

প্রতিষ্ঠা করতে যদি আমরা মার্কসবাদ লেনিনবাদের ভিত্তিতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হই, যদি আমরা তার জন্য পরিশ্রম করতে, আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকি।

বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রঃ

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনায় দেখেছি যে ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মানুযায়ী ধনতন্ত্রের পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে আমাদের এ পশ্চাদ্‌পদ দেশে যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ প্রায় ঘটেইনি, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা জার্মান গণপ্রজাতন্ত্রের মত কারিগরিভিত্তিক, শিল্পোন্নত সমাজতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণ করা সম্ভব হবে কিনা।

একথা ঠিক যে কোন দেশের পক্ষে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য কতগুলো বৈষয়িক ও সামাজিক শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক। একটা উপযুক্ত মাত্রার অর্থনৈতিক বিকাশ না ঘটলে এবং একটা মার্ক্সবাদী পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিকভাবে সচেতন শ্রমিকশ্রেণী না থাকলে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয়। সাধারণতঃ এ সকল শর্ত ধনতান্ত্রিক বিকাশের সাথে সাথে আপনা থেকেই পূরণ হয়ে থাকে আর তাই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের পক্ষে সরাসরি সমাজতন্ত্রে উত্তরণ খুবই সম্ভবপর। কিন্তু যে সব দেশ প্রাক্-ধনতান্ত্রিক পর্যায়ে পড়ে আছে, বাংলাদেশসহ অধিকাংশ সদ্য স্বাধীন দেশ যে শ্রেণীভুক্ত তাদের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। সরাসরি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মত বৈষয়িক অবস্থা এসব দেশে নেই।

এখানে এসে প্রশ্ন উঠে যে এসকল দেশকে কি তাহলে পুরো ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের জন্য?

এর সুস্পষ্ট উত্তর হচ্ছে—না, যে সব দেশে ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার খুব বেশী বিস্তার ঘটেনি সে সব দেশের পক্ষে বর্তমান যুগে পুরোপুরি ধনতন্ত্রকে অথবা তার উন্নত পর্যায়কে এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে পদাপর্ণ করা সম্ভব। কেন এবং কি ভাবে এবং কোন কোন অবস্থায় তা সম্ভব সেটা বুঝতে হলে এবিষয়ে কিছুটা বিস্তৃত তত্ত্বগত আলোচনা প্রয়োজন।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বলশেভিক বা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে যখন রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে, সে সময় রাশিয়াতে ধনতন্ত্র যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিকাশ লাভ করেছিল তা নয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সে সময় সবচেয়ে বেশী বিকাশ লাভ করেছিল জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে। কিন্তু ধনতন্ত্র ও শিল্প বিকাশের দিক থেকে অনুন্নত হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ার পক্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে, ঠিক রাশিয়াতেই না হলেও পৃথিবীর অন্যত্র ধনতন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশ লাভ করেছিল। এই কথাটাকে বোঝানোর জন্যেই আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে বিশ্ব পর্যায়ে ধনতন্ত্রের বিকাশ পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের উদয় সম্ভব নয়। সোজা ভাষার বললে কথাটা দাঁড়ায়, পৃথিবীর অন্যত্র ধনতন্ত্রের আওতায় শিল্প বিকাশ এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নতি ঘটেছিল বলেই রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি নির্বাচন করা। পৃথিবীর কোথাও যদি উচ্চ বিকশিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকত তবে রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হত না পুঁজিবাদী বিকাশের দীর্ঘ স্তর বাদ দিয়ে একলাফে সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়া, তাকে প্রথমে পুঁজিবাদী বিকাশ সমাপ্ত করে তবে অগ্রসর হতে হত সমাজতন্ত্রের পথে।

অনুরূপভাবে, যে সব দেশে পুঁজিবাদী বিকাশ একেবারেই ঘটেনি বা অল্প পরিমাণে ঘটেছে সে সব দেশের পক্ষে এযুগে ধনতন্ত্র এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। কিন্তু তার জন্য কতগুলো অনুকূল পরিবেশ দরকার।

রাশিয়ার ১৯১৭ সালের সফল অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ছিল ধনতন্ত্র। তখন কোন অনুন্নত গ্রাম ধনতান্ত্রিক বা প্রাক্-সামন্ত অর্থনীতি সম্পন্ন দেশের পক্ষে ধনতন্ত্রের বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না; যেমন, গত শতাব্দীতে ল্যাটিন আমেরিকার যে সব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাদের সামনে একটাই পথ খোলা ছিল—সেটা ধনতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে যে সব দেশ ঔপনিবেশিক কবলমুক্ত হয়েছে তাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে—একটা ধনতন্ত্রের পথ, আরেকটা ধনতন্ত্র এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে যাওয়ার পথ। কারণ পৃথিবীতে এখন দুটো প্রধান উন্নত সমাজ ব্যবস্থা পাশাপাশি অবস্থান করেছে—ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। ঐতিহাসিক বিকাশের দিক থেকে বিচার করলে সমাজতন্ত্র বর্তমানে সবচেয়ে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা এবং ধনতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ ক্ষয়িষ্ণু যদিও এটা এখন পর্যন্ত খুবই পরাক্রমশীল। এ পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক দেশের সহায়তায় অনুন্নত দেশের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জাল ছিন্ন করে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদী স্তর এড়িয়ে সরাসরি সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। পুঁজিবাদী বিকাশের পথ এড়িয়ে অন্য পথে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার পন্থাকে আমরা 'অধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ' নাম দেব। আর অধনতান্ত্রিক বিকাশের মাধ্যমে সমাজের যে বৈপ্লবিক রূপান্তর গঠিত হয় তাকে বলা হয় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

অধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ :

লেনিনই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে এ বক্তব্য উপস্থিত করেন যে অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে পুঁজিবাদী স্তর বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্রে যাওয়া সম্ভব। লেনিনের চিন্তায়, উন্নততর দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশের সামনে এ সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। লেনিন বলেন, 'উন্নত দেশসমূহের শ্রমিক শ্রেণীর সহায়তা নিয়ে অনুন্নত দেশসমূহ পুঁজিবাদী স্তর এড়িয়ে সাম্যবাদে পদার্পণ করতে পারে।'

অনুন্নত দেশের পক্ষে অধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে লেনিনের চিন্তার যথার্থতা বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। রুশ বিপ্লবের সময় রুশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ মধ্য এশীয় দেশসমূহে (উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, ইত্যাদি) প্রাক্-পুঁজিবাদী এমন কি প্রাক্-সামন্ত ব্যবস্থা পর্যন্ত বজায় ছিল। মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই এ সকল দেশ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রের অধীনে রুশ ও অন্যান্য জাতিসমূহের সহায়তায় সমৃদ্ধ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সোভিয়েত মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্র সমূহ শিল্প, কৃষি, সংস্কৃতিতে অত্যন্ত উন্নত মান অর্জন করেছে।

১৯২৪ সালে যখন মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এটা ছিল পশ্চাদ্‌পদ দেশ—এর অর্থনীতি ছিল সামন্ত ও গোষ্ঠী অর্থনীতির সংমিশ্রণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সহযোগিতায় মঙ্গোলিয়া অতি অল্প সময়ে পুঁজিবাদী স্তর সম্পূর্ণ এড়িয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছে। মঙ্গোলিয়াতে আধুনিক কৃষি এবং শিল্প যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছে এবং সেখানে উচ্চ মাত্রার বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও সাংস্কৃতিক মান অর্জিত হয়েছে।

আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর একাংশে সমাজতন্ত্র জয়লাভ এবং বিকাশলাভ করার ফলে যে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে পরিস্থিতিতে অনুন্নত, পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে পুঁজিবাদ এড়িয়ে অধনতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্র অভিমুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। কিন্তু এ অধ্যায়ের প্রথমদিকে আমরা ব্যাখ্যা করেছি সে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য যে সকল বৈষয়িক ও সামাজিক পূর্বশর্ত আবশ্যক (উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে যে সকল পূর্বশর্ত ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই পূরণ হয়ে থাকে), অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে সে সকল পূর্বশর্ত অনুপস্থিত থাকে। অধনতান্ত্রিক পন্থার কাজই হল দ্রুত গতিতে এ সকল পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথ সুগম করা।

অধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্যায়ে যে সব কাজ সাধিত হয় তা হল মূলত অর্থনীতির বিকাশ সাধন এবং শ্রমজীবি জনগণের পক্ষে শ্রেণীশক্তিগুলিকে জোরদার করা। অনেকাংশে এটা পুঁজিবাদী বিকাশের অনুরূপ প্রক্রিয়া। কিন্তু অধনতান্ত্রিক বিকাশের মাধ্যমে এ সকল প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে সাধন করা হয় এবং সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ, পুঁজিবাদী বিকাশ তথা পুঁজিবাদী শোষণের যন্ত্রণার হাত থেকে জনগণকে রেহাই দেয়া হয়। অধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কারের সাথে সাথে অনেকগুলো সমাজতান্ত্রিক সংস্কারও সাধিত হয়; যথা, ব্যক্তিগত পুঁজি এবং পুঁজির শোষণকে খর্ব করা, রাষ্ট্রখাতে শিল্প গঠন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও সামাজিক পূর্বশর্তগুলো সৃষ্টি হলে তখনই কেবল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়া চলে।

বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র আসবে অধনতান্ত্রিক বিকাশের মাধ্যমে ঃ

বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার পটভূমিতে এ দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সম্পর্কে আলোচনা করলে উপরের কথাগুলোর অর্থ আরও পরিস্ফুট হবে।

বাংলাদেশ শিল্পে অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ। দুই শতাধিক বছরের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলশ্রুতিতেই আমাদের দেশ আজ অর্থ-নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান হলেও কৃষি এখানে একান্তই অবহেলিত। দেশের ৮০ শতাংশ লোক কৃষক বা কৃষি নির্ভর। এদের ব্যাপক অংশ হল ভূমিহীন ও গরীব কৃষক; ক্ষেতমজুরদের অংশও বিপুল। স্পষ্টতই জমির তুলনায় কৃষকদের সংখ্যা অত্যধিক বলে জমির উপর চাপ অত্যন্ত বেশী। চাষাবাদের পদ্ধতিও আদিম ধরণের। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তার উপর বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষিকে আরও সংকটাপন্ন করে তুলছে।

দেশের শিল্পের বিকাশও নীচু পর্যায়ে রয়ে গেছে। সামান্য কিছু হাল্কা শিল্প, যথা, পাট, বস্ত্র, চিনি, দেশলাই ইত্যাদি মাত্র গড়ে উঠেছে. ভারী শিল্প ও যন্ত্র নির্মাণ শিল্প গড়ে ওঠেনি। এখন পর্যন্ত প্রায় সব রকম ভোগ্য পণ্যের জন্য আমাদের দেশকে বিদেশ থেকে আমদানীর উপর নির্ভর করতে হয়।

দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শোষণের ফলশ্রুতিতে তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মত বাংলাদেশের অর্থনীতিও একটি মাত্র কৃষি সম্পদ তথা পাটের উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে।

সব মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন পর্যন্ত খুবই পশ্চাৎপদ। এ অর্থনীতির বৃহত্তম অংশ অধিকার করে আছে ব্যক্তি মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থা. তার মধ্যে আবার ছোট উৎপাদনকারীর সংখ্যাই বেশী। স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতীয়করণের ফলে অর্থনীতিতে যে রাষ্ট্রীয় খাত গড়ে উঠেছে, এখন পর্যন্ত দেশের অর্থনীতিতে তার প্রাধান্য গড়ে ওঠে নি।

দেশের সমগ্র অর্থনীতির পশ্চাৎপদতার দরুন সাধারণ মানুষের জীবন ধারনের মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং একথা বললে ভুল হবে না যে জনগণের এক বিরাট অংশ মানবেতর জীবনযাপন করে। ব্যাপক খাদ্য ঘাটতির দরুন খাদ্য সমস্যা একটা জাতীয় সমস্যা রূপে বিরাজ করছে—দেশের জনসংখ্যার এক বড় অংশের দুই বেলা আহার জোটে না। জনশক্তির এক বৃহৎ অংশ অপচয়িত হচ্ছে বেকারত্বের অভিশাপ বহন করে। অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখেছে। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি বিকৃত চিন্তা জনগণের বৃহৎ অংশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নারীজাতির উপর সামাজিক নিষ্পেষণ মধ্যযুগের পশ্চাৎপদতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

দীর্ঘকালের পরাধীনতা ও ঔপনিবেশিক শোষণ একদিকে যেমন দেশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে অন্যদিকে তেমনি সমাজকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং নৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে দেশের এ পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে রাতারাতি একলাফে সমাজতন্ত্রে পৌছান সম্ভব নয়। মনে মনে যতই কামনা করা যাক, এ মুহূর্তে সকল লোকের কর্মসংস্থান, আহার, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসার ব্যবস্থা করার মত অবস্থা বিদ্যমান নেই। উৎপাদিকা শক্তি ও বৈষয়িক উৎপাদনের বিস্তার না ঘটালে এ সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব

নয়। উন্নত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন করার মত বৈষয়িক সামাজিক প্রস্তুতিগুলো আমাদের দেশে নেই—উন্নত শিল্প ও কৃষি নেই, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি নেই, উপযুক্ত সংখ্যক উপযুক্ত মানের প্রশিক্ষিত শ্রমিক নেই ; তদুপরি নৈতিক ও মানসিক প্রস্তুতিরও অভাব রয়েছে—যেমন, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও নানাবিধ অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, আত্মস্বার্থ বোধ প্রভৃতি বুর্জোয়া চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।

বাংলাদেশে তাই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করে সমাজতন্ত্রের পূর্ব শর্তসমূহ সৃষ্টি করতে হবে। এবং এ সকল পূর্ব শর্ত সৃষ্টি করতে হবে ধনবাদী পথে নয়, পরন্তু অধনতান্ত্রিক পথে। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের সরকার এমন কতগুলো প্রগতিশীল নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যার ফলে এদেশে অধনতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া পুঁজিসহ সমস্ত পাকিস্তানী পুঁজির শোষণের অবসান ঘটেছে। দেশীয় সমস্ত ব্যাঙ্ক ও বীমা, পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্প এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ জাতীয়করণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় পুঁজি বিনিয়োগ ৩৫ লক্ষ টাকায় সীমিত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির সাথে যৌথ কারবার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সকল প্রগতিশীল পদক্ষেপের ফলে পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে। এর ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে একটা রাষ্ট্রীয় খাত গড়ে উঠেছে সেটা সমগ্র অর্থনীতিতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্ব ও

সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেশী ভারতের সাথে মৈত্রী চুক্তি এবং অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

এ সকল প্রগতিশীল নীতি ও পদক্ষেপ গৃহীত হওয়ার ফলে বাংলাদেশে এক বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সহযোগিতায় এদের সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলার এবং পুঁজিবাদকে খর্ব করে অধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এ সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে পথে বাধাও আছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী এবং তাদের দেশীয় অনুচরেরা ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো দেশের প্রগতিতে বাধা দান করছে ও নানাবিধ চক্রান্ত করছে। প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে বহু প্রতিক্রিয়াশীল দুর্নীতিপরায়ণ, সাম্প্রদায়িক, ধনবাদের অবাধ বিকাশের সমর্থক, সোভিয়েত-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ, ঘেঁষা আমলা রয়েছে। এ সকল আমলারা সরকারের প্রগতিশীল নীতি ও পদক্ষেপসমূহকে বানচাল করার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। সরকারী দল এবং সরকারের ভিতরও দুর্নীতিপরায়ণ, প্রগতি বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা লোক রয়েছে যারা সরকারের প্রগতিশীল নীতির বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করেছে।

এসকল বাধা অপসারণ করে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের পূর্ব শর্তসমূহ সৃষ্টি করার জন্য যা যা করা দরকার তা হল ঃ

* বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও প্রগতির বিরুদ্ধে বিদেশী ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত প্রতিহত করা, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ ও ভারতের সাথে মৈত্রী এবং অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক ইত্যাদি সম্পর্ক দৃঢ় করা ;

* এমনভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করে যেন রাষ্ট্রীয় খাত প্রসার লাভ করে ও জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাধান্য লাভ করে আর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প বাণিজ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায় ;

* রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভারী ও মূল শিল্প নির্মাণ ; রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে খনিজ সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা ;

* পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ; বিদ্যুৎ উৎপাদনের দ্রুত প্রসার. ইত্যাদি।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্প বিকাশের জন্য স্বল্প পুঁজির মালিকদের উৎসাহ ও সুবিধা প্রদান ;

* রাষ্ট্রায়ত্ত এবং ব্যক্তিগত শিল্প কারখানার পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা ;

* সরকারের পক্ষ থেকে কুটির শিল্পকে সাহায্য করা এবং সমবায় ভিত্তিতে তাকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করা ;

* কৃষকের অবস্থার উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমি ব্যবস্থা থেকে সামন্ত প্রথার অবশেষসমূহের শোষণ (বর্গা প্রভৃতি) দূর করা ; সামন্তবাদী শোষকদের জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা ও বিতরণকৃত জমিতে সমবায় চাষ প্রবর্তন করা ; কৃষিতে ধনবাদী বিকাশ রোধের জন্য মেহনতী কৃষকদের সমবায় চাষে উৎসাহিত

করা ; কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য রাষ্ট্র থেকে কৃষকদের যন্ত্রপাতি, সার, কৃষি খনন ইত্যাদি প্রদান করা ;

* রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, সেখান থেকে সাম্রাজ্যবাদী ঘেঁষা ও প্রতিক্রিয়াশীলদের অপসারণ এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীলদের নিয়োগ ; রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক, মেহনতী কৃষক এবং দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী ও তরুণদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া ;

* সকল মেহনতী জনগণ, শ্রমিক, মেহনতী কৃষক, মেহনতী মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকলেই যাতে সমস্ত রকম মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারে এবং গণবিরোধীরা যাতে ঐ সকল সুযোগ নিয়ে দেশের ক্ষতি করতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা ;

* শ্রমিক, কর্মচারীদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী, চাকরীর স্থায়িত্ব, বিশ্রাম, বাসস্থান, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির ব্যবস্থা ; মজুরদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ;

* জনগণের নিরক্ষরতা দূর করা, বৈজ্ঞানিক, সংস্কারমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ; সমস্ত বালক-বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা, বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বৈজ্ঞানিক, কারিগর ও দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টির জন্য উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র, গবেষণাগার ও ব্যবহারিক শিক্ষার বিস্তার সাধন, জাতীয় সংস্কৃতির প্রগতিশীল বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

* সামাজিক নিপীড়ন থেকে নারীসমাজকে মুক্তি দান এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে নারী জাতিকে পুরুষের সাথে সমান অধিকার ও মর্যাদা দান করা ;

* জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সারা দেশে জনগণের মাঝে চিকিৎসার সুযোগ সহজলভ্য করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত মূল কাজগুলো সম্পন্ন করা হলেই কেবল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার এবং অধনতান্ত্রিক পথে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের পূর্ব শর্তগুলো সৃষ্টি হবে। যদি কেউ অধৈর্য হয়ে মনে করেন যে অধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ অতিক্রম না করেই, একবারে কোন ক্রমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে দ্রুত সরাসরি সমাজতন্ত্র কায়েম করা যাবে তাহলে ভুল হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে বৈষয়িক ও সামাজিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি না করে মুখে সমাজতন্ত্র বুলি প্রচার করলে সে সমাজতন্ত্র মুখের কথা বা বইয়ের পাতায়ই থেকে যাবে, বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হবে না। অপরপক্ষে, অধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশকে খর্ব করে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও সামাজিক পূর্ব শর্তসমূহ সৃষ্টি করলে তা অবধারিতভাবে দেশকে সমাজতন্ত্র পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং অধনতান্ত্রিক পথে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব যত অগ্রসর হবে সমাজ-তন্ত্রের দিক থেকে পিছিয়ে আসার সম্ভাবনা ততই সীমিত হয়ে আসবে। তাই বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এটাই সঠিক এবং একমাত্র পথ।

—০—